KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/7 1/8-10 1/11 1/12	Year of Publication : ফাল্গুন, ১৩৮৬ চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬-৮৭ আষাঢ়, ১৩৮৭ শ্রাবণ, ১৩৮৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী	Remarks : VOL & NO. 1/7 ফাল্গুন, ১৩৮৬ 333 - 340 Page Missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ

পত্রিকা

আষাঢ়

একাদশ সংখ্যা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

১৩৪৭

মহুয়ার দেশে

বুদ্ধদেব বসু

বিকেলবেলা পৌঁছলুম। নগণ্য ষ্টেশন, কুলি নেই; নিজেরাই প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো ক'রে মালপত্র নামিয়ে ফেললুম। আশা করেছিলুম আমরা নিরাপদে নামবার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রেনটি ফোঁস-ফোঁস শব্দে ফের রওনা হবে; কিন্তু, যেন আমাদের বিদ্রূপ করবার জন্যেই, সে আরো পাঁচ-সাত মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। ইতিমধ্যে আমরা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে জন সাতেক প্রকৃতির শিশু সংগ্রহ ক'রে ফেলেছি, একজন তার সত্যই শিশু, দশের বেশি বয়েস হবে না। যা-ই হোক, আমাদের রসদের ঝুড়িটা তো সে বইতে পারবে। এই নেহাৎ-বাচ্চাটির মাথায় মোট চাপিয়ে নিজেরা দিব্যি হাওয়া খেতে-খেতে যাবো, এটা প্রথমটায় একটু বিসদৃশ লাগলো, এবং বিবেকের ক্ষণিক পীড়নে ওর হাত থেকে ঝুড়িটা আমি নিয়েও নিলুম। কিন্তু দশ কি বারো পদক্ষেপের পরেই লজ্জিত হ'য়ে হার মানতে হ'লো। মাল বইতে গায়ের জোর ততটা দরকার নয়, যতটা দরকার অভ্যেস, ছোটো হ'লেও ওর কষ্ট সত্যি কিছু হচ্ছে না, উপরন্তু চারটে পয়সা ওর পক্ষে ফ্যালনা নয়, ইত্যাদি চিন্তা দ্বারা নিজের আহত অভিমানকে প্রশমিত ক'রে দিলুম মোটটি ফিরিয়ে যথাস্থানে।

বাংলোয় কিছুরই অভাব নেই। অনেকগুলো ঘর, বড়ো-বড়ো বারান্দা, আসবাবপত্র প্রচুর, ভৃত্যেরা নিপুণ ও ভদ্র, আর আমাদের কপালগুণে গৃহস্বামী স্বয়ং উপস্থিত। তাছাড়া আছে দেয়ালে ঘেরা মস্ত জমি (কলকাতায় অত বড়ো কম্পাউণ্ড পেতে হ'লে বিরলা কি বর্ধমান কি গবর্নর হ'তে হয়), যার এক প্রান্ত ঘেঁষে গেছে রেল-লাইন; অনেক গাছ, একঝাঁক পায়রা, দু'জোড়া হাঁস, এক জোড়া গিনি-ফাউল, বাচ্চাকাচ্চা সমেত অনেকগুলো মুরগি, একটি গোরু আর একটি বালক ষাঁড়—এই শেষেরটির মাথায় টেড়ি-কাটা কালো চুল, পেট ভ'রে সে খায়, আর ফুলবাবুর মতো ঘুরে বেড়ায়, সে শোভাও নয়, তাকে দিয়ে কোনো কাজও হয় না, তবু সে আছে। কিছুদিন পরেই তাকে দিয়ে ইঁদারা থেকে জল টানাবার মৎলব যে তার প্রভু মনে-মনে আঁটছেন, তা সে জানেও না, ভাবছে এমনি গায়ে ফুঁ দিয়েই বুঝি দিন যাবে। আর সেটা না হ'লে অগত্যা একটা গাড়িই ক'রে ফেলা হবে, কারণ অত বড়ো একটা পুরুষ ব'সে ব'সে খাবে এ কিছুতেই সহ্য হয় না। আমার মনে হয় গাড়ি টানার কাজটি তার অপছন্দ হবে না, কারণ এ-কাজে তাকে যারা

লাগিয়েছে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়া তো তার হ'তেই আছে। পারেই আছে বললে ঠিক হয়, কারণ ইচ্ছে করলেই আরোহীসুদ্ধ গাড়ি উল্টিয়ে ফেলতে কতক্ষণ!

এখানে সবই আছে, অতি সূক্ষ্ম সুরুচিও যা চাইতে পারে। তিনটি জিনিসের শুধু অভাব—একটি হরিণ, একটি ময়ূর আর গাছের ডালে ঝোলানো দড়ির দোল্না একটি। আপনি বলতে পারেন যে ইউক্যালিপ্টস গাছের তলায় একটি বসবার যোগ্য বেঞ্চি থাকলেও ভালো হয়, কিন্তু তা থেকে যে-তৃপ্তি পাওয়া যাবে সেটা মানসিক, বাস্তব নয়। অর্থাৎ, বেঞ্চি একটি আছে এ-কথা ভাবতেই যা সুখ; নয়তো যেখানে এত ফাঁকা ও ঢাকা জায়গা, মনোহর একটি শান-বাঁধানো গোল চাতাল, ছাদে ওঠবার লোভনীয় কাঠের সিঁড়ি, সেখানে ইউক্যালিপ্টস গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসবার সময় ও সুযোগ আপনার খুব বেশি হবে না। দোলনার কথা আলাদা—আলস্য-বিলাসের ওটি একটি অতুলনীয় উপকরণ। আর যদি বলেন একটি গ্রীনহাউস থাকলে ছবিটি সম্পূর্ণ নয়, তাও আছে, পাথর-সাজানো, বেঞ্চি-পাতা, যদিও বাইরের চেহারাটা ভাঙাচোরা; কিন্তু ওর ভিতরে গিয়ে বসবার প্রলোভন সম্বরণ করাই ভালো, কারণ এখানে পোষ-না-মানা, অনিমন্ত্রিত, এমন কি অনাকাঙ্ক্ষিত জীবেরও অভাব নেই।

কয়েকমাস আগে একবার এ-বাড়িতে এসে ঘণ্টাচারেক কাটিয়েছিলুম। তখন এখানে এগ্‌জিবিট নম্বর ওআন্ ছিলেন একটি বৃশ্চিক, টিনের কৌটোয় পোরা, তেরোদিনের উপবাসী, তবু অক্ষুণ্ণ বিক্রম। তার কারাগারের ভিতর থেকেই সে ফোঁসফোঁস করছিলো সাপের মতো, আর তার কামড়ও শুনলুম প্রায় সর্পাঘাতের মতোই, হত্যাকারী না হ'লেও যন্ত্রণায় সমান। এই বাড়িতে ও বাগানে বুক-হাঁটা জীবের অভাব থাকলেই অবাক হতুম, বিস্তৃত জমির মধ্যে দু'চারটি সর্পপরিবার কোন্ না বাসা বেঁধেছে! গল্প শুনলুম, পুরাকালে যখন এ-বাড়ি মেরামত হয়, তখন ভাঙা দেয়াল ও ফাটা মেঝে থেকে রোজই দু'একটি সাপ বিরক্ত হয়ে মাথা বের করতো, এবং—বলাই বাহুল্য—সে-মাথা তাদের আর আস্ত থাকতো না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও কয়েকটি বিরাট ও বিষাক্ত সাপ অনর্হিস মানুষের হাতে মারা পড়েছে। এখন শীতের শেষে তাদের এক-আধজনের দেখা অনায়াসেই পাওয়া দেতে পারে—সন্ধের পরে টর্চ না-জেলে পা ফেলি না, এবং টর্চ জ্বাললেই একটি ফণা-তোলা মূর্তির ক্লোজ-অপ্ ছবি ফুটে উঠবে, এমন আশঙ্কায় বুক দুড়দুড় করে।

এখানে ব'লে রাখি যে সর্পজাতীয় জীব সম্বন্ধে আমি দারুণ ভীতু। কথাটা উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে সকলেই ভীতু নন, কেউ-কেউ আছেন সাপকে যাঁরা আমলেই আনেন না, বাংলাদেশের পল্লীতে কত বাড়িতেই তো মানুষ আর কেউটে পাশাপাশি বাস করে—কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। আবার এমন লোকও দেখেছি সর্পবধ যাঁর জীবনের প্রধান প্রমোদ, যেমন আমার সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু হে—বাবু। শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। অতিথিশালার একতলার ঘরে বসে' তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ তিনি বললেন, একটা সাপ যাচ্ছে। ব'লেই উঠে গিয়ে একটা ঢিল ছুড়লেন, তারপর ফের বসে' দিব্যি ঠাণ্ডা মেজাজে আবার গল্প সুরু করলেন, যেন কিছুই হয়নি। আমি বললুম, 'সাপ?' 'ও মরেই গেছে—কিছু না, একটা হেলে,' ব'লে হে—বাবু হাসলেন।

হ'লোই বা হেলে, অন্য-কিছুও তো হ'তে পারতো! অন্য-কিছু হ'লে তিনি খুসিই হ'তেন, অনেকদিন কেউটে মারেন না, হাত নিশপিশ করে। ভাগলপুরে থাকতে এ-বিষয়ে খুব সুবিধে ছিলো তাঁর। আর লক্ষ্যেয়ে একবার—

এখন আমার স্বভাব এই রকম যে জীবিত কি অর্ধ-মৃত, মৃত কি থ্যাঁতলানো, যে-কোনো সাপ দেখলেই আমার বুক-ঢিপঢিপ করে, গলা শুকিয়ে যায়, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল বোধ করি। অতএব হে—বাবুর সর্পমেধ যজ্ঞের বিবরণ শুনে দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলুম, এবং সর্পহননে তাঁর প্রশান্ত নৈপুণ্য আমার যে-বিস্মিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিলো তা সত্যিই অগাধ। এখানে এসে, তাই, আমি যে সতর্কতায় কোনো ত্রুটি রাখলুম না, তা বোধ হয় না বললেও চলে, এবং দিন দুইয়ের মধ্যে যখন একটা টিকটিকির ল্যাজও দেখা গেলো না, তখন আমার সাহস এতটা বেড়ে গেলো যে আমি বন্ধুদের কাছে বার-বার বলতে লাগলুম, 'আঃ, একটা সাপ দেখতে পেলেও হ'তো!'

আশ্চর্য এই যে আমার এ-ইচ্ছা একেবারে অপূর্ণ রইলো না। সন্ধের ঠিক পরে আমরা গ্রামের পথে বেরিয়ে ফিরেছি, উত্তরপূর্বদিগন্ত ঈষৎ ম্লান জ্যোছনা উঠেছে, বাড়ির মধ্যে ঢুকেছি শুনি আমাদের বাবুর্চি জোয়াতালির চ্যাচামেচি। লাঠি ও লণ্ঠন নিয়ে একটা বড়ো মহুয়া গাছের তলায় সে কী দেখছে। কী আর, নকল জিনিস কিছু নয়, সাপ। বন্দুক ও লাঠি দিয়ে অবিলম্বেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করা হ'লো। কথাটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বললুম ব'লে কেউ যেন সন্দেহ না করেন যে এই জীবহত্যার ব্যাপারে আমারও কোনো অংশ ছিলো। অবশ্য আমি একটি টর্চ নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলুম, কিন্তু, সত্যি বলতে, আমি পৌঁছবার আগেই নাগনন্দনের দফা রফা হয়েছিলো। তার মুখের ভিতর দিয়ে একটা কাঠি চালিয়ে তাকে ঘরের বারান্দায় এনে শোয়ানো হ'লো, সেখানে একাধিক লণ্ঠনের আলোয় আমরা সকলে মিলে তাকে মুগ্ধ চোখে দেখলুম। বিষাক্ত জাত, চিতি—বলে এ দেশে। কিন্তু নেহাৎ নাবালক। একটা আঙুলের মতো সরু, দৈর্ঘ্যে এক হাতেরও কম হবে, হলদে গায়ে কালো ডোরা-কাটা। আমাদের অনিষ্ট করবার ক্ষমতা আর তার নেই এটা যখন জানলুম, তখন তার শরীরের রঙের বাহার নিয়ে অনায়াসে একটু কবিত্ব করা যায়। বেচারা ছেলেমানুষ, এই নতুন দক্ষিণে হাওয়ার আমন্ত্রণে বাড়ির বাইরে এসে অকালে মারা পড়লো।

কিন্তু তখনো সে একেবারে মরেনি। গায়ে তার দুটো ছররা লেগেছে, লাঠিও বাড়িও কম খায়নি, তবু লেজের দিকটা মাঝে-মাঝে একটু নড়ছে। হয়তো ওটা রিফ্লেক্স অ্যাক্শন, তবু আমরা প্রস্তাব করলুম যে ওকে একেবারেই ঠাণ্ডা ক'রে দেয়া হোক্। গৃহস্বামী বললেন, 'আহা থাক্ না—এক্‌নি ম'রে যাবে', ব'লে তিনি সাপটির গায়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন। 'আহা, কী সুন্দর!' লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি টিপে টিপে দেখতে লাগলেন, তাঁকে দেখে আমার শিশু কন্যাও সাপকে স্পর্শ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো—আর এমন একটা নতুন ধরণের খেলনা থেকে তাকে যে বঞ্চিত করা হ'লো, সে জন্য বয়স্ক লোকদের উপর তখনকার মতো তার ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিলো এটা সহজেই অনুমান করতে পারি। বন্ধুটিকে সাপের গায়ে অমন নির্বিকারচিত্তে হাত বুলোতে দেখে

সাপ সম্বন্ধে আমারও ভয়টা যেন হঠাৎ অনেকখানি ক'মে গেলো। আসলে এ-ভয়ের সঙ্গে তীব্র একটা ঘৃণাও মিশোনো থাকে, তার ঐ লিকলিকে, কিলবিলে, ঠাণ্ডা-গা, বুকে-হাঁটা চেহারাটা ভাবলেই আমাদের গা-কেমন করে; সাপকে আর পাঁচটা জানোয়ারের মতো স্বাভাবিক একটা জীব ব'লে ভাবতে পারলেই ঘৃণাটা আর থাকে না, তাই ভয়ও ক'মে আসে।

যা-ই হোক, পাছে শ্রীমান চিতি আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তার গা কেটে পার্মেঙ্গেনেট অব্ পটাশ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হ'লো, তারপর মহা সমারোহে অন্য একটি গাছের তলায় শুকনো পাতা আর কাঠ জড়ো ক'রে তাকে আমরা পোড়ালাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে তার চেহারা হ'য়ে গেলো গাছের একটা শুকনো ডালের মতো। মোটের উপর, সন্ধেটি আমাদের জমলো বেশ।

বন্ধুরা পরের দিন বিদায় নিলেন। ভেবেছিলুম, স্বর্গীয় চিতির কোনো ভাই কি বোন জ্ঞাতির খোঁজ নিতে আসতে পারে, এবং সবন্দুক বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার আবির্ভাব খুব সুখকর হবে না। কিন্তু সুখের বিষয় সে-রকম কেউ এলো না, একদিন একটা গিরগিটি জাতীয় জীব আমাদের ওভার-কোটের পকেট তল্লাস করতে এসে বেঘোরে প্রাণ হারালো। আসলে, এত গাছগালা সত্ত্বেও পোষ-না-মানা জীবের সংখ্যা এখানে খুব বেশি নয়, অতিপরিচিত বক বাদ দিলে দু'তিন রকমের বেশি পাখি চোখে পড়েনি, ক্বচিৎ দু' একটা কাঠবেড়ালি, আর সারা দুপুর একটা কাঠঠোকরার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ঠুক্‌ঠুক শব্দ। আশ্চর্যের বিষয়, যদিও বসন্তকাল, একটা কোকিলের ডাক কানে আসেনি। কিন্তু কোকিল যেমন নেই, বিরক্তিকর কাকও নেই, রাত্রে নেই ইঁদুরের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ, তবে এক-এক রাত্রে কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া বেড়াল এসে মহা হল্লা বাধাতো—আর সতর্ক হিটির সে কী দারুণ চীৎকার!

বেড়াল আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, আর রাত্রের ঐ চোরস্বভাব আগন্তুককে চোখে যে কখনো দেখিনি তাতেই আমি খুসি। এখানে পথে-ঘাটে বে-ওয়ারিশ নোংরা কুকুর আর পালিত গোরু, ছাগল, শুয়োর চোখে পড়ে, কিন্তু বেড়াল একটাও না। বোধ হয় সমস্ত গ্রামে ওটাই একমাত্র বেড়াল। প্রার্থনা করি, ওটাই শেষ হোক্। ওর ভাগ্যে জীবনসঙ্গিনী যেন না জোটে। আর জুটলেও, ওদের বিবাহ যেন নিঃসন্তান হয়। কাক আর বেড়াল যেখানে নেই, সে-জায়গাই সত্যি-সত্যি মানুষের যোগ্য।

অন্তত, এ-জায়গাটি যে একেবারেই আমাদের মনের মতো, প্রায় হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রধান মাধুর্য এই যে এখানে কোনো মস্ত নামডাক-ওলা জমকালো দৃশ্য আমাদের মন দখল করে' থাকে না। তুষার কি সমুদ্রের সামনে এলে আমাদের মন এত অভিভূত হ'য়ে পড়ে যে দিন ও রাত্রির বিভিন্ন সময়ে ঐ দেবতাকে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির অর্ঘ্য জানানো প্রায় একটি কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়ায়। নীল, সবুজ, বেগুনি, বাদামি সমুদ্র থেকে চোখ আমাদের ফেরে না, পাছে এই অফুরন্ত-লীলাময়ের কোনো একটি ক্ষণিক, অপরূপ ভঙ্গি চোখে না পড়ে, মন সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে। পাহাড়েও তাই। এত দেখবার, এত বেড়াবার, নতুন পরিচয় করবার এতও আছে! সৌন্দর্যের এমন বেহিসেবি বাজে খরচের সঙ্গে শরীর পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না; একই

সময়ে চারদিক থেকে এত নিমন্ত্রণ আসে যে সমস্তটা ভোগ করবার আশা প্রথম থেকেই ছাড়তে হয়, আর প্রাণপণ পরিশ্রমে সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রেও যাবার দিনে এ-অনুশোচনা মনে থাকে—আহা, ঐ ছায়াআঁকা পথটিতে একদিনও যাওয়া হ'লো না। কিন্তু এখানে ও-সব টানা-হেঁচড়া হুড়োহুড়ি নেই। জায়গাটি প্রায় সমতল; নিতান্ত সাধারণ ব'লেই এ সুন্দর, আর-কোনো কারণে না। তীর্থের পাণ্ডাদের মতো ব্যগ্র সৌন্দর্যগুলি অতিথিকে নিয়ে টানাটানি ক'রে বলে না—আমাকে! আমাকে ছাখো! আমাকে নাও! কাছাকাছি একটা পাহাড় কি ঝরণাও নেই যে দেখতে যাবো—দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে আছে পরেশনাথ, তারপর আর-একটা পাহাড়শ্রেণী, কিন্তু তা এতই দূরে, এতই ঝাপসা ও বিনীত যে তাকে লক্ষ্য না করলে অপরাধ হয় না। তাছাড়া পশ্চিম কোণে খণ্ডৌলি, যেদিকেই বেড়াতে বেরোই, আমাদের চোখে পড়ে। আর? আর আছে রেল-ইষ্টিশান, দু' একটি মুদি দোকান, শালের সারি, মহুয়া-বন, মাঠ, নিড়োনো ক্ষেত, আবার মাঠ, ভরা কলসি মাথায় মৃদুগামিনী তরুণী, আর অর্ধনগ্ন, নোংরা, ক্ষুধিত শিশুর দল।

আর একটি পুকুর আছে। বেশ বড়ো পুকুর, রেল-কোম্পানির, সেখানে কাপড় কাচা কি স্নান করা নিষেধ এ-মর্মে একটি নুটিশ লটকানো আছে। বোধ হয় সেইজন্যেই ওটি সমস্ত গ্রামের একাধারে স্নানাগার ও ধোবাবাড়ী। তাহ'লেও, এত পরিষ্কার জল যে দেখলেই নাইতে ইচ্ছে করে। তেল সাবান বাথরুমের মায়া কাটিয়ে গেলুম একদিন পুকুরে নাইতে, তারপর থেকে রোজই যেতুম। এক পাড়ে গাঁয়ের মেয়েদের জটলা, মাটি দিয়ে তারা নিজেদের ও শিশুদের গা ধুচ্ছে, অন্য-কোনো বস্তু দিয়ে সাফ করছে তাদের রুক্ষ, লালচে চুল, পরিচ্ছন্নতা-বিরোধী শিশুদের চ্যাচানিতে আর বয়স্কাদের সহর্ষ কলরবে দুপুরবেলাটি মুখর। আমার পাশে একটা উলঙ্গ ছেলে উল্টো ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়লো, তারপর সাবলীল গতিতে সাঁৎরাতে-সাঁৎরাতে আমার দিকে ট্যারচা চোখে একটু তাকিয়ে গেলো। 'কেমন—পারো এ-রকম?' এই তার ভাব। লজ্জিত হয়ে মনে-মনে স্বীকার করলুম—না, পারি না। তবু—জলে ভাসতে-ভাসতে উপরের অগাধ নীল আকাশ আর চঞ্চল, উজ্জ্বল বাতাসকে নিজের শরীরে অনুভব করা—এ-সুখ থেকে আমিও বঞ্চিত নই।

ভিজে তোয়ালে মাথায় চাপিয়ে বাংলোয় ফেরা—এখন খাওয়া। জোয়াতাদি কী রেঁধেছে? ডাল, তরকারি, মাছ কি ডিম—মুরগি রাত্রের বরাদ্দ। ডালে সে কখনো নুন দেয় না, তরকারি কি মাছ রাঁধতেই সে জানে না—সত্যি বলতে, এক মুরগির ঝোলটাই তার হাতে খোলে। তবু খিদের গুণে এবং স্থানীয় খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদে যে-পরিমাণ ভাত অন্তর্হিত হয় তাতে নিজেরাই অবাক হই। খাওয়ার পরে যে-সময়টা, সেটাই এখানকার বিশেষত্ব, এই শালবন-খচিত গেরুয়া প্রান্তরের নিজস্ব সৃষ্টি। কলকাতায় দুপুরবেলার অস্তিত্ব নেই, হয় কাজের, নয় আলস্যের চাপে তা নিশ্চিহ্ন। গ্রীষ্মের অমন যে লম্বা দিনগুলি, তাদের আমরা বাধ্য হয়েই বাইরে ঠেকিয়ে রাখি জানলা দরজা বন্ধ করে', অন্ধকার ঘরে পাখা চালিয়ে এক মনে কাজ করতে পারলেই শান্তি—তারপর কোনো-রকমে ঘড়ির কাঁটা বৈকালী চায়ের সময়ে এলে হাঁফ ছেড়ে বলি, 'বাঁচলুম।' আজকের মতো যে দুপুরের আয়ু ফুরোলো তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানে দুপুরবেলার বিশেষ একটি রস আছে, যা'

ঈষৎ মদির। অনেকখানি সময়—এমন নয় যে যে-কোনরকমে কাটাতে পারলে বাঁচি—বরং এ-সময়টা কোনো প্রিয় কবির নতুন বইয়ের মতো, আস্তে-আস্তে, এক-একটু ক'রে নিবিড়ভাবে উপভোগ করবার। আর বিচিত্র কবিতাগুচ্ছের মতোই এখানকার দুপুরগুলি এক-একটি এক-এক সুরে বাঁধা। কোনোদিন আকাশে পাৎলা মেঘ জেরে হাওয়া বয়, ঝরঝর ক'রে শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে—বাগানে আমরা ঘুরে বেড়াই; দেখি, কোন্ গাছ থেকে ঝুরি নেমেছে রাজনৈতিকের হৃদয়ের মতো প্যাচালো, মন্থর লাল লাল ফুল ধরেছে, আর চিকণ সবুজ আমের বোল—একটা নীল রঙের পাখি হঠাৎ এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গেলো। কিংবা বাড়ির বাইরেও যাওয়া যায়, পুকুর পাড়ের উঁচু টিপিটার উপর, মেঘের-ছায়া পড়া কালো জল হাওয়ায় ছলছল করছে, দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে খণ্ডোলি, রেল-লাইন ধ'রে কে একজন যাচ্ছে মাথায় পুতুলের ঝুড়ি নিয়ে, ডাকো তাকে। অন্য-কোনোদিন আকাশ নির্মল নীল, রোদ চড়া, দক্ষিণের বারান্দাতেতে ওঠে, উত্তরের ঠাণ্ডা বারান্দায় চেয়ার টেনে ব'সে বই পড়া। না-হয় চুপচাপ ঘরে ব'সে উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ কি দুটো কবিতার বইয়ের সমালোচনা লেখা যায়—মহিলারা বারান্দায় ব'সে গ্রামোফোনে একই রেকর্ড বারবার বাজাচ্ছেন, কারণ সেটি আমার কন্যার প্রিয়—তারপর এক সময় হাঁস আর মুরগির তুমুল কলরব কানে আসে, জোয়াতালি ওদের খাওয়াচ্ছে, বিকেল হ'লো। দুপুরবেলা এমন একটি সহজ, স্বচ্ছন্দ ছন্দে বিকেলের কোলে ঢ'লে পড়ে যে ভারি ভালো লাগে; দু'জনে কোনো বিরোধ নেই এখানে, রাত্রির প্রতীক্ষায় শেলির দীর্ঘশ্বাস এখানে অবান্তর। মোট কথা, এমন দীর্ঘ, অথচ মধুর দুপুর আর কোথাও আমি পাইনি। কাজ করতে চাইলে প্রচুর করা যায়, আবার ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু না ক'রে, অথচ না-ঘুমিয়ে কাটাতে হ'লে তারও উপকরণের অভাব নেই। একদিকে সময়ের যেমন অগাধ সচ্ছলতা, তেমনি আবার সময় 'বধ' করবারও দরকার করে না।

সন্ধেও হ'লো, এখানকার জীবনও থামলো। কখনো আকাশে একলা চাঁদের রাজত্ব, কখনো ঘুটঘুটে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ তারার ঝাঁক। আমাদের চোখে জ্যোছনার চাইতে এই অন্ধকারই বেশি আশ্চর্য। মিশমিশে কালো, জমাট অন্ধকারে আমরা এতই অনভ্যস্ত যে সন্ধের পরে যখন কালো কাপড়ের ঠাসবুনোন সমস্ত পৃথিবীর মুখে নেমে আসে, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গাছের মাথায়-মাথায় জোনাকি জ্বলে, আমাদের টর্চের আলো দেয়ালের কাছে এক পায়ে দাঁড়ানো তাল গাছটির মাথায় গোল হ'য়ে পড়ে, আর আকাশ যেন তারার ভারে নেমে এসেছে। মাথার উপর চিরন্তন কালপুরুষ, আর উত্তরে সপ্তর্ষি। কিন্তু বেশিক্ষণ তারা দেখা হয় না, খাবার ডাক পড়ে, আর খাওয়ার পরে শুয়ে পড়া ছাড়া আর-কিছুই করবার নেই এখানে।

কোথাও যে বেরোতে হয় না, বাংলোর বারান্দায় ব'সেই যে দু'চোখ দিয়ে জায়গাটিকে নিঃশেষে ভোগ করা যায়, আমার পক্ষে এটাই এর প্রধান আকর্ষণ। আরো সুবিধে এই যে বেরোতে ইচ্ছে হ'লে যখন খুসি এবং যেদিকে খুসি বেরিয়ে পড়লেই হ'লো, ইচ্ছা ও কাজের মধ্যে সাজের ব্যবধান নেই। এখানে যা খুসি প'রে থাকো, যেমন-আছো-তেমনি বেরিয়ে পড়ো, আর তার উপর গরম প'ড়ে আসছে ব'লে অল্প দু'একটা কাপড়েই চ'লে যায়। বেরোবার আগে যে সাজগোজ

করতে হয় না, এ-স্বাধীনতা অত্যন্তই উপভোগ্য, তাছাড়া দুর্লভ, কারণ বেড়াতে গিয়েও পোষাকের দাসত্ব থেকে আমরা মুক্ত হই না—বরং অনেকে অসংখ্য ও বিভিন্ন ছাঁদের পোষাক পরবার সুযোগ পাবেন ব'লেই পাহাড়ে যান। মনে হ'লো আর বেরিয়ে পড়লুম, এ-সৌভাগ্য বিখ্যাত জায়গাগুলির কোনোটিতেই আমাদের হয় না, বেরুতে হ'লেই তোড়জোড় মাজাঘষা কোথায় চিরুনিরে কোথায় জুতোর বুরুশ—সব মিলে এক ঝঞ্ঝাট। এখানে অবাধ স্বাধীনতা। এমন কি, কাপড় ঈষৎ ময়লা হ'লেও যে তক্ষুনি বাক্স থেকে সাফ কাপড় বার করবার তাড়া নেই, এ কী কী আরাম তা আর বলবার নয়।

পুরোপুরি আটপৌরে হবার একটি অনির্বচনীয় সুখ আছে, যা শরীরকে বিশ্রাম দেয়, মনে শান্তি আনে। এখানে সে-সুখে কোনো সামাজিকতার কণ্টক উঁচিয়ে নেই। প্রকৃতিও এখানে আটপৌরে, নিতান্ত ঘরোয়া ও আপন লোকের মতো, তার সঙ্গে মনের ভাষায় কথা কওয়া যায়। প্রকৃতির এ-রূপটি কলকাতায় আমাদের চোখে পড়ে মাত্র আভাসে ইঙ্গিতে, এখানে চারদিকেই সে অফুরন্ত হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অসহ্য কোনো সৌন্দর্য নেই, অসম্ভব সমারোহে সে আমাদের নিঃশ্বাস কাড়ে না, সেইজন্য তাকে লক্ষ্য না-করলেও চলে, অথচ সে সর্বদাই উপস্থিত। প্রকৃতি যেখানে নাম-করা সুন্দর, সেখানে সে আমাদের কাছ থেকে বড়ো বেশি খাজনা আদায় করে, আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের উপঢৌকন নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে তবু সে আরো চায়। কিন্তু এই ব্রাউন মাটির প্রান্তর, ছবির মতো শালবন, আর দূরের পাহাড়ের রেখা—এরা আমাদের উপর কোনো দাবি করে না, এরা দিন-রাত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে—আমরা ইচ্ছে মতো পড়ি, গল্প করি, কি চুপ ক'রে থাকি, কি সারাদিন ঘরে বন্ধ হ'য়ে উপন্যাসের পরিচ্ছেদ লিখি, কালির আঁচড়ে মগ্ন চোখ কোনো অপূর্ব দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হলো, এ-চিন্তায় থেকে-থেকে মন বিচলিত হয় না—এদিকে হাওয়া ওঠে, ঝরা পাতার ঝরঝর শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে পায়রাদের ক্ষীণ গোঙানি শোনা যায়—বাইরে এসে দেখি, আকাশে হাতির রঙের মেঘ করেছে, বৃষ্টি আসবে। সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি নামে, ভিজে মাটির গন্ধে মগজে নেশা লাগে, আর পরের দিন শিশিরে ঝলমল্ সবুজ ভোরটিকে ইচ্ছে করে বাক্সে ভ'রে কলকাতায় নিয়ে যাই। চারদিক এমন নিরিবিলি, এমন চুপচাপ, লোক এত কম ও সময় এত প্রচুর যে এই অনাড়ম্বর প্রকৃতির প্রতিটি ছোটো ছোটো ভঙ্গি আমাদের দিনগুলির মধ্যে বোনা হ'য়ে যায়। মন দিয়ে দেখতে হয় না, চোখ মেলে তাকালেই চোখে পড়ে।

চোখের নেশা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এমন মেয়ে খুব কমই দেখা যায় যাহাদের চটক্‌দার রূপ হয়ত থাকে না, কিন্তু সারা দেহের মধ্যে এমন একটি বস্তু থাকে, যাহা চোখে দেখা যায় না, অথচ পুরুষকে আকর্ষণ করে ঠিক চুম্বকের মত।

অনিলবাবুর একমাত্র কন্যা কমলা ঠিক সেই ধরণের মেয়ে। স্বাস্থ্য আছে, যৌবন আছে,—নাই শুধু অসামান্য রূপ! অথচ যে তাহাকে একবার দেখে, চট্ করিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইতে পারে না, কণ্ঠস্বর যে একবার শোনে, অনেকদিন পর্য্যন্ত সে স্মৃতি তাহার মনে থাকে।

কমলা তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছে। গরমের ছুটি। কলেজ বন্ধ।

শিমুলতলায় তাহাদের একখানা বাড়ী তৈরি হইতেছিল, কমলার বাবা বলিলেন: 'চল এই সময় একবার বেড়াতে যাই শিমুলতলায়।'

শিমুলতলার বাড়ীটা তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, শুধু ছাদটা বাকি! বর্ষার আগে বাড়ী শেষ করিতে হইবে। বাঁশের ভারা বাঁধিয়া বিস্তর রাজমিস্ত্রি কুলিমজুর কাজ করিতেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কুলি মজুরেরা কাজ করিয়া চলিয়া গেল। কমলা ভাবিল বাড়ীটা কেমন হইতেছে দেখা যাক্! এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, একাই হাসিতে হাসিতে বাঁশের মই ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু কাপড় সামলাইবে, না উপরে উঠিবে? ছাদের কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, বাঁ হাত দিয়া কাপড় সামলাইতে গিয়া তাহার পা গেল পিছ্‌লাইয়া! হাত দিয়াও বাঁশটা সে ধরিতে পারিল না, 'মাগো!' বলিয়া প্রাণপণে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পাশেই তাহাদের ইন্দারায় একটা লোক জল তুলিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

সে যদি তাহাকে ধরিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে সেদিন কি সর্ব্বনাশ যে হইত, কিছুই বলা যায় না।

চীৎকার শুনিয়া মা ছুটিয়া আসিলেন, বাবা আসিলেন।—'ভাগ্যিস্ এই লোকটা ছিল!'

লোকটা তখন কাছেই দাঁড়াইয়া কমলার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া হাসিতেছে।

অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তোর নাম কি?'

লোকটা শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

'কোথায় থাকিস?'

বাগানের মালি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল: 'লোকটা হাবা।'

'কথা বলতে পারে না?'

মালি বলিল: 'পারে। তোংলা কিনা, তাই চুপ করে' থাকে। ওর কেউ কোথাও নেই বাবু, ওকে আপনি কলকাতায় নিয়ে যান।'

হাবার কলিকাতায় আসিবার ইহাই সূত্রপাত। শিমুলতলা হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময় অনিলবাবু তাহাকে সঙ্গে আনিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তাহার নাম হইল হাবু।

হাবু শুনিতে পায় সবই, বুঝিতেও পারে সবই,—কথাও বলে, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সব সময় সব কথা বলিতে পারে না।

তা না পারুক্! হাবু যেমন কাজের লোক, তেমনি বিশ্বাসী।

কমলা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, হাবু ততক্ষণ যেন নিশ্বাস লইবার অবকাশ পায় না। সকাল-সকাল কমলাকে কলেজে যাইতে হইবে, অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া হাবু বাজার লইয়া আসে, স্নানের ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র হাবু তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার কাপড়জামা কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়, চায়ের সরঞ্জাম হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া হুকুমের অপেক্ষায় দোরের কাছটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কমলার রুমাল চাই, অডিকোলান্ চাই, পেন্সিল চাই, বোতাম চাই,—কাগজে লিখিয়া দিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া বাজার হইতে হাবু তৎক্ষণাৎ তাহা কিনিয়া আনে, কমলার খাবার জায়গায় আসন পাতিয়া দেয়, রূপার গ্লাসে জল গড়াইয়া রাখিয়া জুতা পরিষ্কার করিতে বসে।

তাহার পর কমলাকে কলেজ বিদায় করিয়া দিয়া হাবুর সময় যেন আর কাটিতে চায় না। অনিল-বাবু বাহির হইয়া যান তাঁহার নিজের কাজে, গিন্নি তাঁহার সেলাই লইয়া বসেন, ঠাকুর চলিয়া যায় সকলকে খাওয়াইয়া দিয়া, বাড়ীতে আর লোকও নাই, হাবুর কাজও নাই!

দুপুরে কমলার ঘরখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে কতক্ষণই-বা লাগে! বিছানাটা উল্টাইয়া আবার নতুন করিয়া পাতে। ড্রেসিং-টেবিলের আর্শীটা মুছিতে গিয়া বড়জোর মিনিট দুই-তিন ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজের মুখখানা হাবু ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। তাহার পর টেবিল-অর্গেনটা মুছিয়াই তাহার কাজ শেষ।

নীচে গিয়া সদর দরজায় খিল বন্ধ করিয়া হাবু বাহিরের ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পোড়া চোখে দিনের বেলা ঘুমও আসে না!

কত লোকই ত' রাস্তা দিয়া পার হইয়া যায়, কিন্তু কমলার পায়ের জুতার শব্দ হাবু কেমন করিয়া যে বুঝিতে পারে কে জানে! কমলাকে বাহিরের বন্ধ দরজার কড়া পর্য্যন্ত নাড়িতে হয় না। পায়ের শব্দ দরজার কাছে আসিয়া থামিতেই হাবু দরজা খুলিয়া দেয়। তাহার পর কমলার পিছু পিছু দোতালায় গিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতে বসে।

কমলা গান গায় চমৎকার। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কমলার অর্গান্ যখন বাজিয়া ওঠে, হাবুর হাতের কাজ তখন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গিয়া বারান্দার এদিকের একটা জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া সেইখানটিতে সে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া গান শোনে। শুনিতে শুনিতে একেবারে সে তন্ময় হইয়া যায়। সে সময় কেহ যদি তাহাকে ডাকে তো আর সাড়া দেয় না। গান শেষ হইয়া গেলে আবার উঠিয়া দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা যে কমলা লক্ষ্য করে নাই তাহা নয়। লক্ষ্য করিয়া মনে-মনেই একটুখানি হাসিয়াছে।

কিন্তু এমন করিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া জানলাটা সে প্রত্যহ বন্ধ করে কেন—সেকথা হাবুকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিবেই বা কেমন করিয়া? হাবু চুরি করিয়া তাহার গান শোনে, জিজ্ঞাসা করিলে বেচারা হয়ত ধরা পড়িয়া অপ্রস্তত হইয়া যাইবে!

কাজেই গান শুনিবার সময় কেন যে সে জানলাটা বন্ধ করে সেকথা সে আজও জানে না।

কিন্তু কমলা না জানিলেও আমরা জানি। হাবু দেখিয়াছে, কমলা গান গাহিতে আরম্ভ করিলেই পাশের বাড়ীর মস্ত বড় একটা ছেলে ওই জানলার পথে হাঁ করিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া কমলাকে দেখে।

কমলা সেদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া তাহার মাকে জানাইল: 'আমি আর একা-একা কলেজে যাব না মা।'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কেন রে? কি হয়েছে?'

কমলা বলিল: 'রোজ দেখি—একটা লোক আমার পিছু-পিছু কলেজ পর্য্যন্ত যায়। ভারি খারাপ লাগে। ট্রামে চড়লুম, দেখি, সেও চড়েছে।'

মা বলিলেন: 'কাল থেকে হাবু তোর সঙ্গে যাবে। আবার আসবার সময় পাঠিয়ে দেবো, নিয়েও আসবে।'

ভাল কথা। পরদিন হইতে হাবু আর-একটা কাজ পাইল। কমলার সঙ্গে কলেজের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া নিরাপদে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসা। আবার ছুটির আগে প্রত্যহ নিয়মিত কলেজের দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকা।

কমলার ভয় কিন্তু তখনও যায় নাই। সেই লোকটা তাহার পিছু লইয়াছে কি-না দেখিবার জন্য পথ চলিতে চলিতে বারম্বার সে পিছন ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায়।

কমলা সেদিন সে-লোকটাকে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল হাবুর চোখ দুইটার দিকে। কমলার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। সেরকম দৃষ্টি সে হাবুর চোখে কোনোদিন দেখে নাই।

সারাটা পথ কমলা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অজ্ঞাতে আবার একবার সে পিছন ফিরিল। কিন্তু তখনও দেখিল, হাবু তাহার সেই এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

এই সামান্য ব্যাপারে এতটা বিচলিত হওয়া তাহার অন্যায়। কমলা বারম্বার এই বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল—তাহারই হয়ত বুঝিবার ভুল। হাবু তাহার একান্ত অনুগত ভৃত্য। সে-জাতীয় মানুষ হাবু নয়!

পরদিন কলেজে যাইবার আগেই দেখিল, হাবু তাহার ছোট ছাতিটি হাতে লইয়া দরজায়

দাঁড়াইয়া আছে। পথ চলিতে চলিতে তাহার মনের ভুলটা সংশোধন করিয়া লইবার জন্যই বোধ করি কমলা একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু না, এ তাহার মনের ভুল হইতে পারে না। হাবু সেদিনও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল। এ-দৃষ্টির আর অন্য অর্থ হইতে পারে না। অন্তত সেটুকু বুঝিবার মত বয়স এবং অভিজ্ঞতা কমলার হইয়াছে।

সেইদিন হইতে কমলার কি যে হইল,—হাবুর মুখের পানে সে আর তাকাইতে পারে না, কোনো-কিছু হুকুম করিতে গিয়া যদিই-বা মনের ভুলে এক-আধবার তাকাইয়া ফেলে, দেখে, হাবুর চোখে সেই এক দৃষ্টি—একাগ্র উন্মুখ হইয়া তাহারই উপর স্থির নিবদ্ধ।

এ-কথা কাহাকেও বলিবার উপায় নাই, কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই! কমলার অবস্থা হইল ঠিক পাগলের মত। দিবারাত্রি মনে হয় যেন একজোড়া চক্ষু অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে গ্রাস করিতেছে। হাবু সঙ্গে যাইবে বলিয়া দু'দিন সে তাহার কলেজে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। হাবু শুনিবে বলিয়া গান গাওয়া বন্ধ করিল।

কিন্তু তবু নিস্তার নাই! হাবু তাহাদের বাড়ীতেই রহিয়াছে। যতই তাহাকে সে এড়াইয়া চলিতে চায়, ততই যেন তাহারই চোখের উপর তাহার চোখ দুইটা গিয়া পড়ে।

কমলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সেদিন সে তাহার মাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল: 'হাবুকে বাড়ী থেকে বিদেয় করে' দাও মা!'

মা একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। মেয়েটা বলে কি? এত ভাল চাকর—কি এমন অপরাধ করিল, যাহার জন্য তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে?

কমলা তাহার অপরাধের কথা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু সেই এক জেদ ধরিয়া বসিল—বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতেই হইবে।

মা ভাবিলেন—নিশ্চয়ই সে এমন একটা কিছু অপরাধ করিয়াছে যাহা হয়ত বলিবার নয়। সুতরাং কাজ নাই ইহাকে আর বেশী ঘাঁটাইয়া। সেইদিনই তিনি হাবুকে ডাকিয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বলিয়া দিলেন—তাহাকে আর তাঁহাদের প্রয়োজন নাই, আজই যেন সে তাঁহাদের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

এই বলিয়া পাঁচ টাকা হিসাবে তাহার এগারো মাসের বেতন পঞ্চান্নটি টাকা হাবুর হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া তিনি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক রকম জোর করিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হাবু কি যেন একবার বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তোৎলা কথা তাড়াতাড়ি মুখ দিয়া বাহির হইল না বলিয়াই হোক্, কিংবা গিন্নি-মা চলিয়া গেলেন বলিয়াই হোক্, বলা তাহার আর হইয়া উঠিল না। নীরবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া টাকাগুলার দিকে তাকাইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কি অপরাধ করিয়াছে জানিবার জন্য পাছে সে যাইবার সময় অনুনয় বিনয় করে—এই ভয়ে কমলা সেদিন দুপুরেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গল্পগুজব করিয়া

ফিরিল একেবারে সন্ধ্যায়।

ফিরিয়াই শুনিল, হাবু চলিয়া গিয়াছে। কমলা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিজের ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া ড্রেসিং-টেবিলের আর্শির সুমুখে বসিয়া কানের দুলজোড়াটা সে খুলিয়া রাখিতেছিল, হঠাৎ নজরে পড়িল, টেবিলের একপাশে পাঁচখানা দশ টাকার নোট ও পাঁচটি টাকা নামানো রহিয়াছে।

কমলা বলিল : 'এখানে টাকা কে রাখলে মা?'

মা ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন : 'টাকা! কোথায়?'

'এই ত, পাঁচখানা নোট আর পাঁচটি টাকা!'

মা অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন। চোখ দিয়া বোধকরি-বা এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া আসিল। হাত দিয়া জলটা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন : 'হতভাগাকে দিয়েছিলুম মাইনে এগারো মাসের হিসেব করে'। ফেলে দিয়ে গেছে!'

কমলা আবার নিয়মিত কলেজে যাইতেছে। এবার আর সে পায়ে হাঁটিয়া যায় না। বাড়ীর কাছে হইলেও টিফিন কাটিয়া ট্রামে উঠিয়া বসে। হাবুর কথাটা মনে পড়িলেই তাহাকে সে চাপা দিবার চেষ্টা করে। ভাবে, চলিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে, সে যেন উহার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

কিন্তু নিষ্কৃতি বোধকরি পাইবার নয়। কমলা হঠাৎ সেদিন ট্রাম হইতে নামিয়াই দেখিল—অদূরে হাবু দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দিকে ঠিক তেমনি করিয়া তাকাইয়া। জোর করিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কমলা কলেজে ঢুকিল। কিন্তু কিছুই যেন সেদিন তাহার আর ভাল লাগিল না। ছুটির পর তাহার এক সহপাঠিনীকে সঙ্গে লইয়া গল্প করিতে করিতে সে কলেজ হইতে বাহির হইল এবং ওবেলায় হাবু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে চড়িয়া বসিল।

হাবুকে সে আবার দেখিয়াছে। তাহার কলেজের সুমুখে, ঠিক সেই একই জায়গায়, একই গাছের নীচে—তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া! কোনো প্রকার অনিষ্ট করে না, কিছু বলিবার জন্য তাহার দিকে আগাইয়াও আসে না, দূর হইতে তাহার সেই একাগ্র দৃষ্টি তাহারই দিকে নিবদ্ধ করিয়া নীরব নিস্পন্দ পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

এমন করিয়া সে আর কতদিন কাটাইবে কে জানে!

সেদিন সন্ধ্যায় কমলা তাহার এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে বন্ধুকে বিদায় করিয়া কমলা ট্রামে উঠিতে যাইবে, ভিড়ের মাঝে একজন যুবক ইচ্ছা করিয়া কমলার গায় গা ঠেকাইয়া sorry বলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া মুচ্‌কি একটুখানি হাসিয়াই সরিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ হাবু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ছোক্‌রাটার হাতে ধরিয়া মারিল তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড়!

ছোক্‌রাটির গায় ছিল জোর, সেও তৎক্ষণাৎ তাহার জামার আস্তিন গুটাইয়া হাবুর পেটের উপর চালাইল এক ঘুসি! হাবুর মাথার চুলগুলা বড় হইয়াছে, মুখখানি শুক্‌নো, মনে হইল অনেক দিন ধরিয়া তাহার বোধ হয় স্নানাহার হয় নাই। বেচারা টাল্ সাম্‌লাইতে পারিল না, সুমুখেই একটা ডবল ডেকার্ বাস্ আসিতেছিল, ঘুরিয়া সে একেবারে গিয়া পড়িল তাহারই সুমুখে। হৈ হৈ করিয়া চারিদিকে লোক জড়ো হইয়া গেল। খুব খানিকটা শব্দ করিয়া ব্রেক্ কষিয়া গাড়ীটাও থামিল বটে, কিন্তু হাবু তখন তাহার চাকার তলায়।

ধরাধরি করিয়া রক্তাক্ত কলেবর হাবুকে যখন গাড়ীর তলা হইতে টানিয়া বাহির করা হইল, তখনও বোধকরি তাহার বাঁচিবার আশা আছে, নিষ্প্রভ চোখের একাগ্র চাহনি দিয়া তখনও সে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

কমলা ছুটিয়া আসিল। বিস্তর লোকজন পুলিশ লইয়া, গাড়ী লইয়া হাঙ্গামা করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি থামাইয়া, হাবুকে তাহাতেই তুলিয়া লইয়া বলিল : 'হাসপাতাল।'

ট্যাক্সি চলিল মেডিকেল কলেজের দিকে। হাবুর বোধকরি অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। কমলা তাহার সেই রক্তমাখা মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ডাকিল : 'হাবু!'

হাবু তখন আপনমনেই বলিয়া চলিয়াছে : 'তুমি গান গাইলেই ছোঁড়াটা জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। এমন মার মেরেছি, আর দাঁড়াবে না।'

কমলা আবার ডাকিল : 'হাবু!'

হাবু চুপ করিল।

তাহার পর, চোখ দুইটি একবার কমলার মুখের পানে ফিরাইয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল : 'দিদিমণি!'

আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। শুধু তাহার চোয়াল বাহিয়া এক ঝলক কাঁচা রক্ত গড়াইয়া আসিল।

কমলা চীৎকার করিয়া উঠিল : 'হাবু!'

হাবু নিরুত্তর!

যাহাকে একদিন সে ঘৃণায় দূরে সরাইয়া দিয়াছিল, তাহারই মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কমলা আবার ডাকিল : 'হাবু!'

মনে হইল, কমলার কোলে মাথা রাখিতে পাইয়া নিতান্ত উদাসীনের মতই হাবু চুপ করিয়া রহিয়াছে।

তাহার কাছ হইতে কোনও জবাব পাওয়া গেল না। শুধু কৃশ্রী কদাকার যে দুইটি চোখের দৃষ্টি কমলাকে একদিন উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দুটি চোখ কমলার মুখের পানে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল।

কিন্তু এ-চাহনির অর্থ আজ তাহাকে কে বলিয়া দিবে?

ডাক্তার আসিয়া বলিল : 'Finished!'

সম্পাদকীয়

ইংল্যাণ্ডে বিমান-আক্রমণ

হিটলারের শক্তিশালী দক্ষিণ-হস্ত মার্শাল গোয়েরিং কিছুদিন আগে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে জার্মানবাহিনী তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে' ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবে। মার্শাল গোয়েরিং-এর এই ঘোষণানুযায়ী ইংল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী সহর ও নগরসমূহের উপর ব্যাপকভাবে জার্মানীর বিমান-আক্রমণ সুরু হয়েছে। এদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের উপর বিমান-যুদ্ধে মাত্র এক সপ্তাহে জার্মানীর মোট পাঁচ শ' আটষট্টিখানা বিমান অস্ত্যেষ্টি লাভ করেছে।

আত্মশ্লাঘাকারী জার্মানী নাকি এর আগে আর এক দফায় জানিয়েছিলো, পনেরোই আগষ্ট তারিখে হিটলার চার্চেলকে সন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে' চুক্তির নির্দেশ দেবেন। জার্মানীর এই গুর্বোদ্ধত ঘোষণাকে ব্যঙ্গ করে' সেদিন বেতার-বক্তৃতায় মিঃ ডাফ্ কুপার বলেছেন, 'বর্তমানে আমরা হিটলারকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত আছি। এখন সত্যিই যদি তিনি এখানে না আসেন তা' হ'লে আমরা মনক্ষুণ্ণ হবো। এবং এখন, আমরা হিটলারকে নিশ্চিতভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আজ পর্যন্ত ইতিহাসে আমাদের দেশের আক্রমণকারিগণ উপকূলে এসে যে-ধরণের অভ্যর্থনা পেয়েছে তিনিও তা' থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবেন না।' নিশ্চিতভাবে ধরে' নেয়া যায়, এই আমন্ত্রণ হিটলারের শ্রুতিগোচর হয়েছে, এবং অবিলম্বে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ নিয়ে এই আমন্ত্রণ-রক্ষায় অগ্রসর হবেন।

যদি ধরে' নেয়া যায়, ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর বর্তমান অভিযান প্রারম্ভিক ভূমিকা মাত্র, এর পর ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরভাগে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলি আক্রমণ করা হবে,—তা'হ'লেও, আমাদের ধারণা, ম্যাজিনো লাইনের বাধা অতিক্রম করা যতো সহজে সম্ভব হয়েছে, বিরাট ব্রিটিশ নৌবহর জার্মানীর উদ্বিগ্ন চিত্তে তেমন-কোনো সহজ সম্ভাবনার আভাষ ইঙ্গিত দিচ্ছে না। বরং, এ-সম্বন্ধে বিশিষ্ট মার্কিন সংবাদদাতা মিঃ এইচ. আর. নিকারবোকার যে-অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : 'জার্মানী যতদিন পর্যন্ত পাঁচ হাজার এরোপ্লেন নিয়ে একযোগে ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরভাগস্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থলগুলি আক্রমণে প্রবৃত্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে আসল যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে বলা চলবে না।' জার্মানীর নিজস্ব সমরনীতিবিদ্ অধ্যাপক বার্ন্‌শেও এই মত প্রকাশ ক'রেছেন যে, ইংল্যাণ্ডের উপকূলভাগের কয়েকটি বন্দরের ক্ষতিসাধন করলেই ব্রিটেন মাথায় হাত দিয়ে বসবে না—একমাত্র ক্রমিক অবরোধের পথে হয়তো ইংল্যাণ্ড জব্দ হ'তে পারে।

এখনো ব্রিটেনের বিপুল নৌশক্তি জার্মানীর পরিকল্পিত এই ক্রমিক-অবরোধকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবার ক্ষমতা রাখে, মনে হয়। তারপর, প্রত্যহ জার্মানীর যে-পরিমাণ বিমান-

ধ্বংস ও লোক ক্ষয় হচ্ছে তা'তে তার দ্বারা আর এই ক্রমিক-অবরোধও সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। ব্রিটেনের-দরজায় এসে হিটলার যে এমন হোঁচট খাবেন, এ তাঁর ধারণার বহির্ভূত ছিল নিশ্চয়ই।

বড়লাটের ঘোষণা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটি

মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে সম্প্রতি ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির যে দীর্ঘ অধিবেশন হ'য়ে গেল, ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক দিক থেকে তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকদিন আগে বড়লাট যে-বিবৃতি দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে ওয়ার্কিং-কমিটি দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বড়লাটের ঘোষণা বর্তমান আকারে গ্রহণের অযোগ্য।

বড়লাটের বিবৃতিতে যখন কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করা হয় নি, বরং বিপরীত কথাই বলা হয়েছে, তখন নতুন করে' আবার মিটমাটের পথ অনুসন্ধানের মধ্যে কী মহান্ সার্থকতা থাকতে পারে তা' আমাদের বুদ্ধির অগম্য। দক্ষিণীদল পরিচালিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি নিজেদের শক্তিকে সংগঠন করবার প্রেরণা কবে লাভ করবেন জানি না, তবে আশ্চর্য, বড়লাটের বা ভারতসচিবের কোন্ উক্তির কী তাৎপর্য বা ভাষ্য তা নিয়ে এখনও তাঁরা কয়েক শত রাত্রি বিনিদ্র যাপন করতে পারেন! চরকার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ছেড়ে বিরাট জনশক্তির ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রতি পক্ষকে বাধ্য করবার মতো তীব্র ও বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ কী কংগ্রেসের পক্ষে এখনও সম্ভবপর নয়? হয়তো পরমুখাপেক্ষিতায় এমন কোনো বিশেষ নেশা আছে যা দক্ষিণপন্থী নেতাদের পক্ষে অপরিহার্য!

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

বাঙ্‌লার মন্ত্রীমণ্ডলীর নতুনতম কীর্তি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল। দিকে-দিকে এই মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রী মাননীয় ফজলুল হক বলেছেন যে এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের কথা তিনি একেবারেই অবগত নন্। অথচ, স্কুলের শিক্ষকগণ, কলেজের প্রফেসরমণ্ডলী, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র সমূহ প্রত্যহ উচ্চকণ্ঠে এই বিলের প্রতিবাদ করছে।

এই বিলের প্রতিকার-কল্পে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে তাঁরা আইন সভায় প্রথম থেকেই বাধাদান করবেন। হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিসেব করে' দেখিয়েছেন যে, মন্ত্রীমণ্ডলীর বর্তমান নীতির ফলে তিরিশ হাজার হিন্দু বালক মক্তবে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এবং, প্রস্তাবিত শিক্ষা-বোর্ডে এবং তার কার্যনির্বাহক সভায় কি ভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় তা' বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে' দেখানো হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা! অতঃপর, আইন সভার সংগ্রামেও মন্ত্রীমণ্ডলীর বাক্য-বিক্রম এই বিলের জয়গান করবে সন্দেহ নেই!

স্বরাজ ও মহাত্মা গান্ধী

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় স্বরাজ লাভের উপায় স্বরূপ গঠনমূলক নৈতিক অনুশীলনীর এক ফিরিস্তি প্রকাশ ক'রেছেন। এই ফিরিস্তিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতাবর্জন,

সুরাপান নিবারণ, খাদি, গ্রামশিল্প, গ্রামস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, রাষ্ট্রভাষার প্রচার, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তেরো দফার কর্মতালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

স্বীকার করি, আমাদের জাতীয়-মেরুদণ্ড নানা কারণে দুর্বল। জগতের স্বাধীন এবং পরাধীন সব জাতিরই এইরূপ দুর্বলতা কিছু-না-কিছু মাত্রায় নিশ্চয়ই আছে। এই সব দুর্বলতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে' দীর্ঘ দিনের কৃচ্ছ্র-সাধনে তা সংশোধনের পর যে-স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয় তা পরাধীনতার গ্লানির চাইতে কিছু আস্বাদযুক্ত হলেও শক্তি-উপার্জিত সত্যিকারের স্বাধীনতা কিনা সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মিউনিসিপ্যাল সংশোধন আইন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংস্কার-সম্পর্কে আর একটি বিল আনয়নের যে-সব আয়োজন আন্দোলন হচ্ছে, তা মূলেই ব্যর্থ করবার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন-নিযুক্ত স্পেশাল কমিটি বিলটি সর্বতোভাবে পরিবর্জনের জন্য সুপারিশ ক'রেছেন। এবং কর্পোরেশনের সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে এই কমিটির সুপারিশ সমর্থিত হয়েছে। পরিণাম বিবেচনা করে' প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতাঙ্গ সদস্যেরা পর্যন্ত এই বিলের প্রতিবাদ ক'রেছেন।

কিন্তু আফ্‌শোষের কথা এই যে, পৌরবৃন্দের প্রতিনিধিদের মনোনীত মেয়র পৌর-প্রতিনিধিদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে' এই অনিষ্টকর বিলটি সমর্থন ক'রেছেন। মেয়র সাহেব যখন এইভাবে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে সাহস পেলেন তখন পৌরসাধারণের তরফ থেকে সমস্ত সদস্যের সম্মিলিতভাবে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করানোই কর্তব্য নয় কি?

বাঙ্‌লায় জনস্বাস্থ্য

বাঙ্‌লার পল্লী-অঞ্চলের উপেক্ষিত অধিবাসীদের নানাবিধ রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার অধিকতর সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর স্বয়ং একটি নতুন কর্মপদ্ধতি রচনা ক'রেছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে দু' দু'টি ইউনিয়ন নিয়ে এক-একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠিত হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন করে' ডাক্তার নিযুক্ত করা হবে, এবং প্রত্যেক ডাক্তারের অধীনে দু'টি ইউনিয়নের জন্য দু'জন করে' হেল্‌থ্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্, একজন ধাত্রী ও একজন ভৃত্য থাকবে। শোনা যাচ্ছে, এই কর্মপদ্ধতি অনুসারে প্রায় আড়াই হাজার ডাক্তারের প্রয়োজন হবে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমানে সরকারী কার্যে নিযুক্ত প্রায় চার শ' স্যানিটারী ইনস্পেক্টরকে বেকার হ'তে হবে। গভর্ণমেণ্ট এই সব স্যানিটারী ইনস্পেক্টরকে জনস্বাস্থ্য বিভাগের নতুন কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিযুক্ত করতে পারেন না কি?

একটি কবিতা

সমর সেন

(শ্রীমান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

(১)

ঘন মেঘ, স্নিগ্ধ গন্ধ;
বাঁশী কি স্তব্ধ একেবারে,
আর যাবে না যমুনার জলে,
নীল চোখে, নীল মেখলা শরীরে,
বিলম্বিত পদক্ষেপে, উদ্ধত যৌবনে?

দূরে তীব্রগন্ধ স্ফুলিঙ্গ, খরশব্দ;
স্বপ্নলব্ধ ওষুধ বাঁচাবে কী করে'?
সূর্যোদয় বহুক্ষণ পরে,
ইতিমধ্যে অন্ধকারে জানোয়ার ঘোরে,
ভয়াল আস্ফালনে আকাশ ভরায়,
স্থলে জলে অন্তরীক্ষে মরণের ধ্বনি হানে।

পোষা মুষলে দেখি যদুবংশ ধ্বংসপ্রায়,
আজ কী করে' যাবে যমুনার জলে,
নীল চোখে, মেখলা শরীরে,
বিলম্বিত পদক্ষেপে, উদ্ধত যৌবনে?

(২)

কাছের কোনো গাছে কোকিল ধরেছে তান;
আমি বলি ভাই কাজ নেই বিসম্বাদে,
পলিটিক্স-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
... ...
জন্মমৃত্যু প্রেম, এরাই ত ঘোরতর বিপ্লব।
....
বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে।

মৃত্তিকা

হীরালাল দাশ-গুপ্ত

পরিক্রমি নিষিদ্ধ পথেরে
অণু-পরমাণুশূন্য শরণে-শরণে
ব্যর্থ চক্রমন—
কা'রও দু'টি শুক্র চন্দ্র চোখ
অথবা নক্ষত্র কোনোও তুলিয়া অঙ্গুলি
নাহি করে সুদূর-সঙ্কেত
চিহ্নহীন চরণে-চরণে
পরিচিত চলা-পথে-পথে
শরীরের মতো ঘন রম্য বীথিকায়!

তবু স্বপ্ন-সুন্দরীর সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে
ফেণায়িত শৃঙ্গারের সুরা
সৃষ্টির তরঙ্গ তোলে রক্তের সাগরে!
ভৌম ভ্রান্তি বিভীষিকা ক্ষণ-বিহ্বলতা—
পলাতক-চেয়ে-থাকা বিমূঢ় বিস্ময়ে
পরিহাস করি নক্ষত্রেরে :
মুহূর্ত্ত বিভ্রম শুধু—
বেদনার রূঢ় ব্যভিচার!
সূর্য্য-সত্য আতঙ্কের আনে ইতিহাস
স্নায়ুতে-স্নায়ুতে আর ভ্রূমধ্য সাগরে!

হে সুপ্ত সুন্দরি,
অন্ধকার এ-হাতের নিবিড় বেদনা হ'তে জাগো,
মৃত্যু-কালো পঞ্জরের কারাগার হ'তে
উদ্ভাসিত হও তুমি আলোক-লুণ্ঠিতা
হে সুপ্ত সুন্দরি;
অঙ্গে অঙ্গ বিস্তারিয়া শাখা-প্রশাখায়
ঘন বৃক্ষ আরোহন আকাশের শিখরে-শিখরে,
(ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ শূন্যে শূন্যে নীল বিহঙ্গম)
অবশেষে স্বর্গ আলিঙ্গন—
নিষ্ঠুর শীতল মৃত্যু!
পরিচিত শরীরের প্রথম পতন!
(পৃথ্বী হ'তে পার্থিবের নাহি কোনও ঊর্দ্ধ-পলায়ন!
বালিতে ধ্বসিয়া পড়ে বালির পাহাড়!
মানুষের মর্ম্মকথা ব্যর্থ পরিহাস;
তবুও আকাশে পাখী পাখা মেলিয়াছে!)

বাঘ

সুনীলরঞ্জন ঘোষ

বাঘগুলি সারারাত বনে বনে ঘোরে,
ঘোরে আর আশেপাশে আড়চোখে চায়।
চোখগুলি যেন ঠিক আগুনের টিপ,
বাঁকা রেখা রৌদ্রের আঁকা সারা গায়।

ভিজে ঘাসে সারারাত জেগে থাকে তারা—
সবুজের মাঝে দাগ রঙ বে-রঙের।
নরম শরীরগুলি জাপানী পুতুল,—
জাপানী পুতুল নয়—ফুল রেশমের।

সারারাত বাঘগুলি কি যেন কি চায়:
শুক্‌নো পাতায় শুনি থাবার আঘাত।
রক্তের দাগগুলি জ্বলে' ওঠে নখে,—
আঁধারের বুক চিরে হেসে ওঠে দাঁত!

শঙ্খ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্র ছুড়েছে বাষ্প, মেঘে মেঘে বজ্রের মন্দিরা
গ্রীষ্মের বন্ধুর পথে মেঘবর্ণ রথ
কেঁপেছে পর্ব্বত।

স্থির গ্রীষ্মে মহুয়ার জলন্ত অরণ্য,
অগ্নিসেনা রোমাঞ্চিত,
ক্ষুরধার।
অনেক বসন্ত পরে আবার সূর্য্যেরা,
তারোপরে গুরু গুরু বজ্রের মন্দিরা
মেঘবর্ণ রথ
কেঁপেছে পর্ব্বত।

বিকশিত বাসনার কুসুমিত পথ :
আত্মদান, আত্মসাৎ, বলিষ্ঠ বিলাস।
অনেক বসন্ত পরে বজ্রের মন্দিরা
মেঘবর্ণ রথ ;
অনেক বসন্ত পরে কেঁপেছে পর্ব্বত।

বাজে শঙ্খ, সমুদ্রের কারুশিল্পময়।
অস্পষ্ট বাষ্পের মত পিছনের ফেলে-আসা দিন।
(ছিলাম তোমার কাছে ?)
সূর্য্য দিল নীল মদ্য সান্ধ্য পেয়ালায়।

বাজে শঙ্খ সমুদ্রের কারুশিল্পময়
সম্মুখে প্রলয়।
সমুদ্র ছুড়েছে বাষ্প, মেঘবর্ণ রথ
কেঁপেছে পর্ব্বত।

সভ্যতা ও অবদমন

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞানের গণ্ডী ছিল সীমাবদ্ধ। বিশ্ব-ব্যাপারের বহু রহস্যই ছিল তার কাছে অনাবিষ্কৃত—প্রকৃতির হাতে সে ছিল নিতান্ত অসহায়। খাদ্য সংগ্রহ, বাসস্থান সন্ধান, বংশ বৃদ্ধি আর বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ, এই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য এবং এদিক থেকে পশুর সঙ্গে তার বিশেষ কোন তফাৎই ছিল না। ধীরে ধীরে তার ভেতর জ্ঞানের বিস্তার ও বুদ্ধির বিকাশ হ'লো—বাইরে থেকে যেখানেই সে পেলো ধাক্কা, সেখানেই সে মননশক্তি প্রয়োগ করে' আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে আরম্ভ করলো। এই ভাবেই এলো ঘর বাড়ী তৈরী করা, বিধিবদ্ধ উপায়ে চাষ করা, দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করা, দুর্গ পরিখা নির্ম্মাণ, ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য পানীয় ইত্যাদির নিত্য নূতন আবিষ্কৃতি। ক্রমে ক্রমে গড়ে' উঠলো সমাজ……ধর্ম্ম এলো, শিল্প সাহিত্য এলো, বিবাহ আচার-অনুষ্ঠান অনেক-কিছু এসে আদিম সরল জীবনকে রীতিমতো জটিল করে' তুললো।

দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ, যন্ত্রশক্তি সমন্বিত আজকের যে জীবন, তার স্থিতি এই আদিম ভূমিকার উপর। এদিক থেকে সভ্যতার একটা স্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝি—তা হচ্ছে ধাপে-ধাপে আদিম বর্ব্বরতার অবস্থাকে ছাড়িয়ে ওঠা। যে সোপান পরম্পরার ভেতর দিয়ে মানুষের এই অগ্রগতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিকেই আমরা বলি সভ্যতার এক একটি স্তর। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে, তা থেকে আবার এক স্তরে মানুষ ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে—এর বিরাম নেই। আর তা নেই ব'লেই সভ্যতা জিনিষটা আমাদের কাছে একটা চলমান ক্রমোন্নতির স্রোত বিশেষ। আদি যুগ থেকে মধ্যযুগে, তা থেকে আধুনিক যুগে, মানুষের ইতিহাস ক্রমশঃ জটিলতর, বিচিত্রতর, সূক্ষ্মতর হয়েই এসেছে—এক যুগের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা করেছে আর এক যুগকে পথ নির্দ্দেশ এবং সে-যুগের প্রয়াস প্রচেষ্টার বর্গফল দিয়েছে তার পরের যুগকে প্রেরণা।

কিন্তু সভ্যতার এই যেমন একটা দিক, তেমি আছে আর একটা দিক, যেখানে মানুষ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়েছেও প্রচুর। সে হ'লো সভ্যতাজনিত অবদমনের ফল। আদিম মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি ছিল প্রবলতর, তাদের চরিতার্থতার পথ ও পদ্ধতিও ছিল অনেক বেশী প্রশস্ত। যৌন ব্যাপারে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তার কোন জবাবদিহি ছিল না, বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে কোন আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের মুখ চাইতে হতো না—যথেচ্ছ স্বাধীনতার অপরিমিত ব্যবহারে জীবন তার ছিল ষোলআনা বহির্মুখী। সভ্যতার যত প্রসার হয়েছে, ততই তার স্বাধীন প্রবৃত্তির মুখে পড়েছে বিধি-নিষেধের লাগাম—শক্ত হতে হতে ক্রমেই তা অনতিক্রমনীয় হয়ে উঠেছে। সভ্য মানুষের বহির্জীবনে তাই স্বাধীনতার সীমা এসেছে

ছোট হয়ে। বাইরের এই ক্ষতিপূরণ করার তাগিদেই সভ্য মানুষের জীবনধারা হয়ে পড়েছে বড় বেশীরকম অন্তর্মুখী এবং তার ফলও ফলেছে।

আদিম মানুষ তার প্রতিপক্ষকে যখন হাতে পেয়েছে, ছিঁড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে' দিয়েছে, নয়ত নিজে তাই হয়েছে। কাম চরিতার্থ করার জন্যে চালিয়েছে নির্লজ্জ নির্মমতার অভিযান। সভ্য মানুষ তার বদলে শত্রুকে শিক্ষা দিতে নেয় আদালতের আশ্রয়, কামবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য করে আইনসম্মত উপায়ে প্রাণিগ্রহণ। বলা বাহুল্য, বাইরে থেকে এসবের বেশ একটু সুষমাই দেখা যায়—পশুর মতো প্রত্যক্ষ উপায়ের সাহায্য না নিয়ে, পরোক্ষভাবে বুদ্ধির প্রবর্তনা দিয়ে মানুষ প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে এবং সেইভাবে সভ্য-জীবনের শ্রী ও শৃঙ্খলা বাঁচিয়ে চলে। কিন্তু সত্যি সত্যিই মানুষ যে তার আদিম পশুত্বকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি, শুধু বাইরে তার ওপর একটা শিষ্টতার আবরণ টেনে দিয়ে ভেতরে ভেতরে তাকেই সযত্নে লালন করে' চলেছে, এটা বোঝা যায় অনায়াসেই। আজ দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে সেই হত্যা হানিই করে, সমাজ-বহির্ভূত পতিতাদের সংসর্গে সেই যৌন যথেচ্ছাচারই চলে—শুধু লোক-সাধারণের দৃষ্টিতে সেটা ঢাকা দিয়ে রাখতে চায় ঐই জন্যে যে সভ্যতার প্রভাবে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সেবা ও খুনোখুনিকে আমরা নিন্দনীয় ভাবতে শিখেছি।

এই ভাবে চাপা-দিয়ে চলবার বুদ্ধি ও তার অনুকূল উপাদান উপকরণ আবিষ্কারও তাই সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েই চলেছে। প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডার তোলপাড় করে' এক দিকে মানুষ যেমন জলে স্থলে শূন্যে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, স্বাভাবিকভাবে যেখানে তার ছিল যে বাধা, কৃত্রিম উপায়ে সেখানেই করেছে তার ক্ষতিপূরণ, অন্যদিকে তেমি তার প্রচ্ছন্ন বর্বরতাকে বুদ্ধির পালিস দিয়ে মানান সই করে' নেবার জন্যেও করেছে লক্ষ-লক্ষ উপায় উদ্ভাবন। ব্যভিচার করা এবং জন্ম-নিরোধকের সাহায্যে তার পরিণতিকে এড়ানোই হোক, আর সরাসরি অস্ত্রাঘাত না করে' ইঞ্জেক্সনের সাহায্যে শরীরে প্লেগের বীজাণু চালিয়ে দেয়া এবং সেই ভাবে হত্যাপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টাই হোক—সর্বত্রই চলেছে সেই অন্তর্নিহিত পশুত্বের ক্রিয়া, শুধু বিশেষত্ব এইটুকু, ওপর থেকে ধরবার উপায় নেই।

আদিম মানুষের আচরণ ছিল নৃশংসতর, কিন্তু তাকে আবৃত করার কোন তাগিদ ছিল না, কারণ তাকে দোষ বলে' বুঝবার সামর্থ্যই ছিল না তার। সভ্যতার প্রভাবে এগুলিকে আধুনিক মানুষ জানে দোষ বলে', তবু এগুলির অনুষ্ঠান করে—প্রতি মুহূর্ত্তে তাই সে নিজের পদচিহ্ন মুছে চলতে চায়। এই যে ভেতরের তাগিদ ও বাইরের প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বিরামবিহীন সঙ্ঘর্ষ, এর ভেতর দিয়েই সভ্য মানুষের জীবন বলেই সে-জীবনে আবদমনের এত উৎপাত! ইচ্ছা মাত্রেই শত্রু নিধন, উদ্রেক মাত্রেই কামতৃপ্তি, আবশ্যক মাত্রেই শরীরধর্ম্ম পালন আমরা করতে পারি না—পুলিস আছে, জনসাধারণ আছে, পরলোক আছে। পদে-পদে বাধা, পদে-পদে বিধি অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাদের গলা আঁকড়ে রয়েছে। অথচ এই সমস্ত স্বাধিকারের মোহ আমরা ভুলতে পারি নি, তাই এই সমস্ত বিধি-বিধানকে ফাঁকি দেবার প্রয়োজনেই আমাদেরকে বের করতে

হয়েছে রকমারি কলকৌশল! (অবশ্য অনেকগুলো ব্যাপারে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে আমাদের ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলোও এমন ভাবেই পোষ মেনে গিয়েছে যে অর্থ না বুঝে, সার্থকতা না ভেবে আমরা তাদের দাসত্বও করি। সম্পূর্ণ একক ভাবে আপন ঘরেও যে আজ উলঙ্গ থাকতে পারি না, কি তার কারণ? সে ঐ পুরুষাগত অবদমনেরই ফল।)

যারা বাইরের কলকৌশলে ঢেকে ভেতরকার প্রবৃত্তিগুলোকে চরিতার্থ করতে অসমর্থ, তাদের ভেতরও অবদমনের আর একটা রূপ দেখা যায়—তারা নকল প্রতীকের আশ্রয়ে আসলের অভাব পূরণ করে' থাকে। আদিম মানুষের আরণ্যক জীবনকে আজ আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই টবে গাছ পুঁতে, বাড়ীতে জীবজন্তু পুষে—আদিম মানুষের যৌন স্বাধীনতাকে উপভোগ করি কলা-চর্চ্চার ভেতর দিয়ে, তার গোষ্ঠী-জীবনের সংগ্রামশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখি রাজনীতির হট্টগোল দিয়ে। ভিতরে তরঙ্গিত হচ্ছে প্রবল ও প্রতিরোধহীন ইচ্ছাশক্তি—বাইরে বাধার অন্ত নেই, যেখানে বাধা অতিক্রমের বাঁকা পথ আছে, সেখানেও মাথা খাড়া করে' রয়েছে সংস্কৃতির অহঙ্কার। সুতরাং সাধারণের চেয়ে সংস্কৃতিবানদের অবদমনের প্রয়োজন আরো বেশী এবং এই কারণে তাদের জীবনধারা আরো বেশী জটিল।

তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের ইতিহাস দিনের পর দিন যতই এগিয়ে এসেছে, ততই তা'র অনুসন্ধানী দৃষ্টি যেমন নূতন নূতন পথে প্রসারিত হয়ে গেছে এবং তার ফলে তার বস্তু-জীবন ও ভাব-জীবনে নব নব সঞ্চয় ও সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, তেমি তার স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিগুলিকে আবেষ্টনী এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনে এসেছে সুকঠোর অবদমনের তাগিদ। অর্থাৎ মানব-সভ্যতার একটা দিক হ'লো আহরণ, আর একটা দিক অবদমন—এই দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সভ্য মানুষের জীবন প্রকৃতির এলাকা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে। এত দূরেই এসেছে যে আজ আর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোন যোগ আছে বলেই মনে হয় না। প্রকৃতির আলো বাতাস জলকে আজ আমরা পাই কৃত্রিম যন্ত্রের ভেতর দিয়ে, কৃত্রিম উপায়ে করি খাদ্য পানীয় প্রস্তুত, পোষাক পরিচ্ছদ, গাড়ীঘোড়া ইত্যাদির প্রভাবে খোলা হাওয়া, উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত মৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের সকল সংস্রবই গেছে ছিন্ন হয়ে। প্রকৃতির যে-সমস্ত শক্তি জীবদেহের অনুকূল, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা তাই আজ শারীরিক স্বাস্থ্য হারাচ্ছি এবং কৃত্রিম ওষুধ দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করছি।

এই কৃত্রিমতার প্রভাব আমাদের মন পর্য্যন্তও প্রসারিত হয়েছে এবং সেদিক থেকেও আমরা কম ঠকছিনে। ক্রমাগত চেপে চেপে চলার ফলে, আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো ভেতরে অযথা তরঙ্গিত হতে হতে অনেক স্থলে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধরছে বিকৃত রূপ। সভ্য সমাজে হিষ্টিরিয়া, নিউরসথেনিয়া, উন্মাদনা প্রভৃতির দ্রুতপ্রসার কিজন্যে হচ্ছে, তা আমরা সকলেই জানি। আগেই বলেছি ভব্যতার পালিস দিয়ে আদিম বৃত্তির উদ্দামতা যথাসম্ভব টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছে—তারি জন্যে চরমতম সভ্যতার স্তরে এসেও মানুষ বেশ্যাবৃত্তিকে স্বীকার করেছে, যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে এবং চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়াতি, ঠকামিকে বিতাড়িত করে নি। তবু ব্যাপক

ভাবে এদের প্রয়োগ যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য—আর সেই জন্যে ব্যক্তি-জীবন সভ্যতার প্রভাবে বিকৃত না হয়ে পারে নি। বাইরে থেকে দেখলে যাঁকে অত্যন্ত শিষ্ট সজ্জন বলে' মনে হয়, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তাঁরো ভেতর একাধিক উদ্ভটপণা রয়েছে—অন্যান্য ব্যাপারের চেয়ে কাম-ব্যাপারেই এর প্রকাশ অধিকতর স্পষ্ট। কেউ আত্মরতি পরায়ণ, কেউ সমজাতীয় আসক্তিগ্রস্ত, কারুর পশুপ্রীতি প্রবল—এ ছাড়া মূত্রপায়ী, শুক্রভোজী, পদলেহী, মুখমেহী, নানা-শ্রেণীর বিকারগ্রস্তই আছেন, যাঁদের এই দিকগুলি ছাড়া আর সব দিকেই বেশ স্বাভাবিক সুস্থতা দেখা যায়। এমন কি সমাজে এবং রাষ্ট্রে যাঁদের স্থান অনেকের ওপরে, তাঁদের মধ্যেও এই জিনিষের অভাব নেই।

যাঁরা ঠিক এই স্তরে নেমে আসেন নি—কোন না কোন একটা সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চায় আত্ম নিয়োগ করেছেন, যেমন কবি-সাহিত্যিক, ধর্ম্মগুরু, স্বদেশকর্ম্মী—বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁদের মনের ধারা-ধরণও যথেষ্ট সুস্থ নয়। উপকরণানুরাগ বা প্রতীকোপাসনার ভেতর দিয়ে তাঁরা বাস্তবকে ভুলে থাকেন এবং তথাকথিত কল্প-লোকের আশ্রয়েই তাঁদের প্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতা হয়ে থাকে। সামাজিক জীবনের গণ্ডীতে এলে এঁরাও যে কি ভীষণ বিকৃত ও কৃত্রিম চেহারা ধরতে পারেন, তার পরিচয় আমরা হামেশাই পেয়ে থাকি। সাহিত্যসেবী, দেশসেবী, ধর্ম্মজ্ঞ ইত্যাদির ব্যভিচার-কাহিনী সব দেশেই প্রসিদ্ধ—কিন্তু এর জন্যে তাঁরা দায়ী নন, দায়ী সভ্যতা, যার বাধ্যতামূলক অবদমন তাঁদের করেছে বাস্তববিমুখ এবং যে-বিমুখিতা তাঁদের মস্তিষ্ক-ক্রিয়াকে চালিয়েছে বিকৃতির দিকে। সুতরাং একেবারে বর্ব্বরতার স্তরে যারা নেই, তারা ছাড়া বিকৃতি প্রায় সকলের পক্ষেই আজ অপরিহার্য্য এবং এই হ'লো সভ্যতার সর্ব্বশেষ ফসল।

এখনকার কতক চিন্তাশীল এই কৃত্রিমতার বিরোধী হয়ে উঠেছেন, তাঁরা আবার নগ্নতাকে ফিরিয়ে আনার, প্রকৃতিতে গিয়ে মিশবার আন্দোলন চালিয়েছেন। কিন্তু সে বৃথা! ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করতে করতে মানুষ আজ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এখান থেকে পিছু হটে' অতীতে যাবার তার আর উপায়ই নেই। আজকের এই শিল্প-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ, যন্ত্রোপকরণ-চালিত, রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ন্ত্রিত জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে-চুরে আমরা আর বর্ব্বর হতে পারি না—এগুলোকে রাখতেই হবে বাঁচিয়ে। আর এগুলি থাকলেই, এদের ক্রিয়ার সঙ্গেই থাকবে প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ যতক্ষণ সভ্যতা থাকবে, ততক্ষণ থাকবে অবদমন—এবং অবদমন থাকলেই আসবে কৃত্রিমতা, আসবে অস্বাভাবিকতা, আসবে বিকৃতি।

সহরতলী

—দ্বিতীয় খণ্ড—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যামিনী ফিরিয়া আসিল এবং পরাধীনতায় অভ্যস্ত মানুষও যেমন বড়রকম একটা ঘা খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য গা' নাড়াচাড়া দিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয় সেই-রকম চার টাকা পথ খরচ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল।

'আমাদের স্বাধীন কর', বলাটাই এ ধরণের আন্দোলনের প্রচলিত প্রথা। যামিনীও রাগ করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে দাবী করিয়া বলিল, সত্যপ্রিয় তার ভিন্ন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিক।

'ভিন্ন থাকবে? মেসে?'

'আজ্ঞে না। অন্য একটা বাড়ী নিয়ে—'

সত্যপ্রিয় সমস্তই বুঝিতে পারিতেছিল তবু জামাইয়ের ছেলেমানুষী রাগ কমানোর জন্য মৃদু একটু হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিল, 'আমার তো আর বাড়ী নেই বাবা, এই একটা ছাড়া।'

'ছোটোখাটো একটা বাড়ী ভাড়া নেওয়ার কথা বলছিলাম।'

এবার একটু গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'বেশ তো, সেজন্য ব্যস্ত হবার কি আছে! কিছুদিন যাক না!'

যামিনী একগুঁয়ের মত বলিল, 'আজ্ঞে না, দু'চার দিনের মধ্যে একটা বাড়ী ঠিক করে' চলে' যাব ভাবছিলাম।'

সত্যপ্রিয় এবার রীতিমত গম্ভীর হইয়া গেল।

'দু'চার দিনের মধ্যে চলে' যাবে ভাবছিলে? তা বেশ তো। একটা বাড়ী দেখে নাও, কলকাতায় তো বাড়ীর অভাব নেই। কিন্তু, একা একজনের জন্য একটা বাড়ী না নিয়ে মেসে হোটেলে থাকাই সুবিধে হ'ত না?'

তখন যামিনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে, একা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার কথাটা সে ভাবিতেছে না, সকলকে সঙ্গে নিয়া যাওয়াই তার ইচ্ছা।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'আমাকে তার ব্যবস্থা করে' দিতে হবে, না? মাসে মাসে বাড়ী ভাড়াটাও আমাকে দিতে হবে তো?'

'আমার মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিলে—'

'কিসের মাইনে? একজনকে বসিয়ে বসিয়ে মাসে দু'শো টাকা হাত খরচা দিলে কি আপিস চলে বাপু? কাজকর্ম্ম শিখলে হয়তো একদিন মাইনে হবে তোমার. এখন আমার পকেট থেকে যে

হাত খরচার টাকাটা দিচ্ছি, সেটা আর বাড়াতে পারব না। কমিয়ে দিতে হবে কিনা কে জানে—বড় টাকার টানাটানি চলছে আমার।'

খুব সকালে যামিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ঝগড়ার পর না খাইয়াই আবার চলিয়া গেল। বিকালে অজিতের সঙ্গে সে গেল যশোদার বাড়ী।

সত্যপ্রিয় চার টাকা পথ খরচ দিয়া জামাইকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে যশোদা এ-খবরটা জানিত। অজিত খবর দিয়াছিল। অজিত মহীতোষের বন্ধু, বুদ্ধিটাও মহীতোষের তেমন খারাপ নয় যে ঘরের কোন কোন খবর বন্ধুর কাছেও চাপিয়া যাইবে।

যামিনীকে দেখিয়া যশোদা একটু অবাক হয়, তার প্রস্তাব শুনিয়া তার একেবারে চমক লাগে।

'আমার এখানে থাকবেন মানে কি গো জামাইবাবু?'

অজিত বুদ্ধিমানের মতো একটু তফাতে সরিয়া গিয়াছিল। যামিনী গম্ভীরভাবে বলিল, 'শ্বশুরের অন্ন আর কতকাল ধ্বংস করব চাঁদের মা? তাই ভাবছি, অজিতবাবুর মতো আপনার এখানে ঘর ভাড়া করে' থাকব।'

একা?'

'উঁহুঁ, সবাইকে নিয়ে থাকব—অজিতবাবুর মতো।'

যশোদা হাসিয়া ফেলিল। সত্যপ্রিয়ের মেয়েকে নিয়া যামিনী তার বাড়ীতে ঘরভাড়া করিয়া থাকিবে! এমন ছেলেমানুষী কথা যশোদা জীবনে কখনো শোনে নাই।

'ঝগড়া হয়েছে বুঝি শ্বশুরের সঙ্গে?'

'ঠিক ঝগড়া নয়, ওখানে আর বাস করা যায় না। কি কুক্ষণেই যে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিলাম চাঁদের মা।'

প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত যশোদা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইয়াই যামিনীর মুখ খুলিয়া যায়, দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেন তার শেষ হইবে না। ব্যাপারটা বুঝিতে যশোদার বিশেষ কষ্ট হয় না, সত্যপ্রিয়কে সে তো চেনেই, যামিনীর মত ছেলেরাও তার অজানা নয়। অন্য কারও ঘরজামাই হইলে যামিনীকে সে আমল দিত কিনা সন্দেহ, সস্নীক যামিনীকে বাড়ীতে থাকিতে দিলে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইবে সেটা সে বেশ অনুমান করিতে পারে। তাছাড়া, বেশীদিন বড়লোক শ্বশুরকে অবহেলা করিয়া শ্বশুরবাড়ীর আরাম ছাড়িয়া এখানে কষ্ট করিয়া থাকিবার মানুষ যামিনীও নয়, তার বড়লোক শ্বশুরের কন্যাটিও নয়। একবার ডাক আসিলেই ফিরিয়া যাইবে। সত্যপ্রিয়কে একটু নরম করার জন্য দুদিনের জন্য এ বিদ্রোহ। তবু দু'দিনের জন্যও সত্যপ্রিয়কে একটু বিপাকে ফেলা চলিবে শুধু এই জন্যই যশোদা যামিনীর প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল।

প্রতিহিংসা? তাছাড়া আর কি বলা চলে! মুখোমুখি দু'টি বাড়ীতে পঁচিশ ত্রিশটি মানুষকে নিয়া যশোদার ছিল গুছানো সুখের সংসার, সত্যপ্রিয় সে-সংসার ভাঙিয়া দিয়াছে। সত্যপ্রিয়কে একটু জ্বালাতন করার সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়! ক্ষতি করার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়া সুখ পাওয়ার

স্বভাব যশোদার নয়, সত্যপ্রিয়কে আঘাত দেওয়ার জন্য কোন উপায় আবিষ্কার করার কথাটা তার মনেও আসে নাই, যামিনী বাড়ী বহিয়া আসিয়া প্রতিশোধের এরকম একটা সুযোগ হাতে তুলিয়া না দিলে যশোদা কোনদিন কিছু করিত না। তাছাড়া, মেয়ে-জামাইকে এভাবে বাড়ীতে রাখিলে সত্যপ্রিয়ের ধনসম্পদও নষ্ট হইবে না, হাতপাও ভাঙিবে না। সহ্য করিতে হইবে নিছক একটু মানসিক অশান্তি। যশোদার অশান্তির তুলনায় সে আর কিসের অশান্তি!

'উনি কি মেয়েকে আপনার সঙ্গে আসতে দেবেন?'

'উনি না দিন, ওঁর মেয়ে আসবে।'

'মেয়েকে চুরি করবেন!' বলিয়া যশোদা হাসে।

যশোদা তামাসা করুক, যামিনীর সমস্যা কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল তাই, সত্যপ্রিয়র মেয়েকে চুরি করিবে, না সকলের সামনে বুক ফুলাইয়া তার হাত ধরিয়া সত্যপ্রিয়ের বাড়ী ছাড়িয়া আসিবে? সত্যপ্রিয়কে জানাইয়া তার মেয়েকে নিয়া বাড়ী ছাড়া সহজ ব্যাপার নয়, যদিও সে-মেয়ে যামিনীর আইন আর শাস্ত্রসম্মত বৌ।

যোগমায়ার সঙ্গে সে দেখা করে দুপুরে, সত্যপ্রিয় যখন বাড়ী থাকে না। পর পর তিনটি দুপুর পরামর্শের পর যোগমায়া মন স্থির করিতে পারে। গরীবের মতো কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঁচিবার অর্থ যোগমায়ার জানা নাই, কিন্তু যশোদার বাড়ীতে থাকিবার কথায় সে খুঁতখুঁত করিতে থাকে। কলিকাতায় এত বাড়ী থাকিতে যশোদার বাড়ীতে কেন? তাছাড়া বাপের বাড়ীর এত কাছে একজনদের বাড়ীতে থাকাটা কি উচিত হইবে না ভাল দেখাইবে? নাটক ছাড়া মানায় না এমন অনেক বড় বড় আবোল-তাবোল কথা বকিয়া যশোদার বাড়ীতে বাস করিতে যোগমায়াকে যামিনী যদি বা রাজী করাইতে পারে, চুপি চুপি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে যোগমায়া কিছুতেই রাজী হয় না।

'কেন, আমি কি পাপ করছি? স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী যাব, তা লুকিয়ে চুরিয়ে যাব কেন?'

'বাবা যেতে দেবেন না।'

'খুব দেবেন।'

আসল কথা, যোগমায়ারও সখ চাপিয়াছিল, একটু বেড়াইয়া আসিবে, জীবনে একটু নতুনত্ব আনিবে। রাজপ্রাসাদের মত এতবড় বাগান-ঘেরা বাড়ী, ঘরভরা গাদা গাদা আপনজন আর আত্মীয়স্বজন, এত সব দামী আসবাব আর দাসদাসী, নানা উপলক্ষে প্রায়ই লোকজনকে খাওয়ানোর হৈ চৈ, কর্তার মেয়ে বলিয়া সকলের উপর এতখানি কর্তৃত্ব, তবু যেন যোগমায়ার সব একঘেয়ে লাগে। বিবাহ হইলে ভাল লাগিবে ভাবিয়াছিল, যামিনীর সঙ্গে রাত কাটাইতে ভাল লাগেও বটে, কিন্তু তাতে কি মানুষের মন ওঠে, বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্রব-বিহীন অল্পবয়সী একটি মেয়ের মন?

যোগমায়ার রাগও হইয়াছিল। যামিনীকে দেশে পাঠানোর জন্য নয়, চার টাকা পথ-খরচ দিয়া যামিনীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এই গুজবটা রটিয়াছে বলিয়া। তার স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে তার বাবা, সকলের কাছে তার স্বামীকে এমনভাবে অপমান করে! স্বামীর সঙ্গে ঘরে উপবাস করিবে (কিছুদিন করিবে, সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হইয়া ফিরাইয়া আনিতে গেলেই

ফিরিয়া আসিবে) তবু আর সে এমন বাপের বাড়ীতে থাকিবে না।

সুতরাং সত্যপ্রিয়ের বাড়ীতে সত্যই হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

মেয়েদের মধ্যে ফিসফাস গুজ্‌গাজের শেষ রহিল না, সকলেই বুঝিতে পারিল যে যামিনী রাগ করিয়া যোগমায়াকে নিয়া যাইতেছে, তবু যোগমায়া বাড়ীর যেখানে যায় সেখানেই যেন তাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসু মেয়েদের সভা বসিতে লাগিল। কেবল সত্যপ্রিয়ের অনুমতি চাহিতে যাওয়ার সময় কেউ সঙ্গে গেল না।

যামিনী দুপুরবেলা তার অনুপস্থিতির সময় আসা-যাওয়া করিতেছে শুনিয়া সত্যপ্রিয় মনে মনে একটু হাসিয়াছিল, আর দু'একদিনের মধ্যেই যামিনী আসিয়া পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। আসল ব্যাপারটা তার কানে গিয়াছিল সকালে যোগমায়া অনুমতি চাহিতে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায়। তারপর সত্যপ্রিয় মনে মনে আর হাসে নাই বটে, মেজাজটাও গরম করে নাই। খবরটা দিতে আসিয়াছিল রসিক, খবর দিয়া আফশোষের শব্দ করিয়া বলিয়াছিল, 'আচ্ছা বিপদ হ'লো তো!'

সত্যপ্রিয় আশ্চর্য্য হওয়ার ভাণ করিয়া বলিয়াছিল, 'কিসের বিপদ?' তার সঙ্গে লড়াই করিবে তার টাকা দিয়া কেনা জামাই? সত্যপ্রিয়ও লড়াই করিতে জানে।

দুরু দুরু বুকে ঘরে গিয়া যোগমায়া দ্যাখে কি, সত্যপ্রিয় মেঝেতে মোগাসনে বসিয়া সামনে খবরের কাগজ বিছাইয়া ঝুঁকিয়া কাগজ পড়িতেছে।

কি ভাবে কথাটা বলা যায়? কি ভাবে বাপকে জানানো যায়, আমি তোমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম?, মাথা ঘুরিয়া, গা কাঁপিয়া যোগমায়া অস্থির হইয়া পড়ে, কি ভাবে যে কথাটা বলিয়া বসে নিজেই বুঝিতে পারে না।

সত্যপ্রিয় আগেই মুখ তুলিয়াছিল, সহজভাবে বলে, 'যামিনী নিয়ে যাবে? আচ্ছা। কবে যাবি?'

যোগমায়া বলে, 'আজ।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'বেশ।'

যোগমায়ার পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। আশা নয়, যোগমায়ার বিশ্বাস ছিল সত্যপ্রিয় কখনো তাকে পাঠাইতে রাজী হইবে না, রাগ করিবে, বকুনি দিবে, তাকে বুঝাইবে—আর যে কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে যে, তোমার জন্যেই তো সব গোলমাল, তুমি কেন ওকে অপমান করলে! তার বললে, একি! এক কথায় তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া দিল? এখন তো আর না গিয়া উপায় থাকিবে না!

সত্যপ্রিয় খবরের কাগজ পড়িতে মন দেয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে যোগমায়া বলে, 'আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না বাবা, আমায় আসতে দেবে না।'

সত্যপ্রিয় অন্যমনে বলে, 'বেশ তো।'

যামিনী আসিলে খবরটা দিয়া যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করে, 'কি উপায় হবে এখন?'

এত সহজে অনুমতি পাইয়া যামিনীরও ভাল লাগিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া বলে, 'ভালই তো হ'ল।'

'ছাই হ'ল! তোমার মাথা হ'ল!' বলিয়া যোগমায়া কাঁদিতে থাকে, কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা নাড়িয়া বলে, 'আমি যাব না।'

রাগ করিয়া যামিনীর সঙ্গে ক'দিনের জন্য চলিয়া যাওয়ার কল্পনায় যোগমায়া যত মজা আবিষ্কার করিয়াছিল তার একটাও এখন আর সে খুঁজিয়া পায় না। যা ছিল ছেলেমানুষী তাই ভয়ানক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

যামিনীর সঙ্গে যোগমায়ার ঝগড়া হইয়া যায়।

বাপকে গিয়া যোগমায়া বলে, 'না বাবা, আমি যাব না। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'আমাদের আবার কষ্ট কিসের!'

বাপের ব্যবহারে মর্ম্মাহত যোগমায়ার দারুণ অভিমানে আবার মনে হয়, যামিনীর সঙ্গে যাওয়াই ভাল, সত্যপ্রিয় যতদিন নিজে না আনিতে যায় ততদিন না আসাই ভাল।

তবু, কোনরকমে চোখ কান বুজিয়া সে বলে, 'তুমি যদি ওকে একটু মিষ্টি করে' বুঝিয়ে বল বাবা—'

সত্যপ্রিয় বলে, 'তোরা দু'জনেই বড় বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস্, মাথায় চড়ে' গেছিস দু'জনে।'

অগত্যা যামিনীর সঙ্গে যোগমায়া যশোদার বাড়ীতে গিয়া উঠিল। রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় বাড়ীতেই ছিল। যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিয়া করিয়া সত্যপ্রিয় বাড়ী ফিরিবার পর রওনা হইয়াছে। যাওয়ার সময় সত্যপ্রিয় যদি নরম হয়।

আগে পরে দুজনে সত্যপ্রিয়কে প্রণাম করিল। সত্যপ্রিয় যামিনীকে বলিল, 'সাবধানে থেকো' আর যোগমায়াকে বলিল, 'সাবধানে থাকিস্।'

কয়েক মিনিট পরেই যশোদার বাড়ী। যশোদা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল, সুব্রতা হাত ধরিয়া যোগমায়াকে ভিতরে নিয়া গেল, পাড়ার যেসব মেয়েরা যশোদার বাড়ীতে সত্যপ্রিয়ের মেয়ের পদার্পণ দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। যশোদাকে যোগমায়া চেনে, তার বাড়ীটা কোনদিন স্বাধে নাই। সে ও ভিতরে ঢুকিয়া এদিকে চোখ পড়িতে লাগিল সেইদিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে লাগিল। ঘর দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, এই ঘরে তাকে থাকিতে হইবে! খাটপালঙ্ক, আলমারী, ড্রেসিংটেব্‌ল্ এ-সব না থাক, একি দেয়াল, একি মেঝে, একি দরজা জানালা! কতটুকু ঘর! সুব্রতা আনন্দে ডগমগ হইয়া বলে, 'যাক্, এ্যাদ্দিনে একজন মনের মত সঙ্গী জুটল! তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কথা এত শুনেছি ভাই!'

'তুমি আমার ভাইকে চেনো?'

'চিনি না? কবে থেকে চিনি!'

'কি করে' চিনলে ?'

প্রশ্ন শুনিয়া মনের মত সঙ্গী সত্যই জুটিয়াছে কিনা সে বিষয়ে বড়ই সন্দেহ জাগায় সুব্রতা একটু দমিয়া যায়।

যশোদা যোগমায়াকে দেখিয়াই দমিয়া গিয়াছিল। পাড়ার মেয়েদের আস্তে আস্তে বিদায় করিয়া সে যামিনীকে নিয়া পড়িল।

'আপনার কেমন ধারা বিবেচনা জামাইবাবু ?'

'কেন চাঁদের মা ?'

'দু'দিন বাদে ওর ছেলেপিলে হবে, ওকে নিয়ে এসময় টানা-হ্যাঁচড়া হাঙ্গামা আরম্ভ করেছেন ? প্রথমবার লোকে কত সাবধানে রাখে, মন ভাল রাখার জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়, আর আপনি এমন একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। বয়স তো কম হয় নি আপনার ?'

যামিনী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'এখনো দেরী আছে।'

যশোদা ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ছাই আছে। ও দু'চার মাস সময় কোন্ দিক দিয়ে কেটে যাবে টেরও পাবেন না। দেরী থাকলেই বা কি, এ সময় কেউ এমনি হাঙ্গামা করে ?'

যশোদার বড় অনুতাপ হয়। সত্যপ্রিয়কে খোঁচা দেওয়ার কথাটা ভাবার সময় তার মেয়ের কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল। সে অবশ্য জানিত না যোগমায়ার এরকম অবস্থা, তবু এতটুকু একটা মেয়ের পক্ষে এরকম গণ্ডগোল সহ্য করা যে কঠিন ব্যাপার এটা তো সে জানিত।

কি আর করা যায়, যোগমায়ার মনটা একটু ভাল করার জন্য যশোদা চেষ্টা আরম্ভ করে। গল্প জুড়িয়া দেয়, হাসি-তামাসা করে, গম্ভীরমুখে বলে, 'দু'দিনের জন্য বেড়াতে তো এলে দিদি, দু'দিন বাদে কর্ত্তা যখন গাড়ী পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, ঘর যে তখন আমার খালি হয়ে যাবে বাছা ?'

'বাবা আর আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না যশোদা দিদি।' যোগমায়া কাতরভাবে বলে।

যশোদা হাসিয়া বলে, 'থামো বাছা তুমি। বাপ কখনো মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে !'

কুমুদিনী প্রথম হইতে একপাশে মুখ বুজিয়া বসিয়াছিল, এবার সে সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করে, 'রাগারাগি করে' এসেছে বুঝি ?'

যশোদা বলে, 'কিসের রাগারাগি ! সংসারে অমন কথা কাটাকাটি হয়।'

তারপর যোগমায়া যশোদার সঙ্গে যেন একেবারে আঁটিয়া যায়। অনেক দিন আগে, যশোদার বাড়ীতে যখন শুধু কুলি মজুরের আস্তানা ছিল আর সত্যপ্রিয় হঠাৎ যশোদাকে খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, একদিন সত্যপ্রিয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া বেয়াদবী করার জন্য যশোদা যোগমায়াকে আচ্ছা করিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিল। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করিয়াছিল সেদিন যোগমায়া। আজ রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসে আর বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, ঘরের দেয়াল সরিয়া সরিয়া আসিয়া চাপ দিতে থাকে আর দম আটকাইয়া আসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়, যোগমায়া যশোদার কাছে সরিয়া সরিয়া আসে, পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

'ঘরটা গুছিয়ে নাও ?' যশোদা বলে।

'আমার কি হবে যশোদা দিদি !' যোগমায়া বলে।

ধনঞ্জয় ঘরে আর রোয়াকে বসিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল, এক ফাঁকে চুপিচুপি যশোদাকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা এখানে থাকবে নাকি চাঁদের-মা ?'

যশোদা বলে, 'না।'

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া যশোদা উনান ধরাইতেছে, যামিনী উঠিয়া আসিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু।

'ঘুমোচ্ছে ?'

'হ্যাঁ। এই তো ঘুমোলো চারটের সময়।'

যশোদা তা জানিত।

'খুব কেঁদেছে, না ?'

'শুধু কান্না ! কি বিপদেই যে পড়লাম চাঁদের-মা !'

যশোদা তাও জানিত। একটা আফ্‌শোষের শব্দ করিল।

যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'একটা বড় দেখে বাড়ী ঠিক করে' উঠে যাব চাঁদের-মা ?'

যামিনীর কাছে শ'খানেক টাকা আছে, যোগমায়ার কাছেও আছে সাতাত্তর টাকা। যোগমায়ার গায়ে আর বাক্সে গয়না আছে অনেক। কিন্তু যশোদা সংক্ষেপে বলিল, 'বড় বাড়ীতে কি হবে ? ক'টা দিন যাক।'

যশোদা ভাবিয়াছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সত্যপ্রিয়ের কোন আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া আসিবে। কিন্তু চার পাঁচদিন কাটিয়া যায় কারও পাত্তা মেলে না। সত্যপ্রিয় যেন সত্যই মেয়ে-জামাইকে ত্যাগ করিয়াছে। যোগমায়ার অবস্থা দিন দিন কাহিল হইতে থাকে, যশোদা না থাকিলে ইতিমধ্যেই হয়তো তার নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটিয়া যাইত। যশোদা তাকে আদর করে, ধমক দেয়, নানা ভাবে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখে। কিন্তু মনের যার জোর নাই একেবারে কতটুকু মনের জোর তার মধ্যে সংক্রামিত করা যায় ? ধার-করা মনের জোর কতক্ষণ কাজে লাগে ? গরীবের মেয়ে হইলেও বরং কথা ছিল।

সাতদিনের দিন সকালে মহীতোষ আসিল। অজিত আর সুব্রতার সঙ্গে মহীতোষ মাঝে মাঝে আড্ডা দেয়, তবে সেটা তার নিজের গাড়ীতে অথবা মাঠে ঘাটে হোটেল সিনেমায়, যশোদার বাড়ীর মধ্যে নয়। এবার কোথা হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে একটা পিঁড়ি দখল করিয়া বসিল।

যোগমায়া তো আনন্দে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম।—'দাদা ! দাদা এসেছো ! তুমি কোত্থেকে এলে দাদা ? বাবা পাঠিয়েছে ?'

মহীতোষ নিষ্ঠুরের মত নির্ব্বিকার হাসি হাসিয়া বলিল, 'বাবা পাঠাবেন বৈকি ! কাউকে আসতেই বাবা আরও বারণ করে' দিয়েছেন, বাবা পাঠাবেন !'

যোগমায়া দমিয়া গেল।—'বারণ করে' দিয়েছে!'

'করবেন না? যা কীর্ত্তিটাই তোমরা করলে!'

যশোদা মৃদু প্রতিবাদের স্বরে বলিল, 'আহা, কেন মিছে ঘাব্‌ড়ে দিচ্ছেন ওদের? রাগ করবেন সে তো জানা কথা—বাপ-মার রাগ কি টেঁকে? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহীতোষ সায় দিয়া বলিল, 'তা যাবে—তা যাবে। নিশ্চয় যাবে। তবে কিনা—তা ঠিক, সব ঠিক হয়ে যাবে বৈকি।'

যোগমায়ার মন যতই খারাপ থাক আর বাড়ীঘরের অবস্থার জন্য যতই কান্না আসুক, এটা তো ধরিতে গেলে একরকম তার নিজের বাড়ী, এখানকার কুঁড়েঘরেও তারই তো সংসার। মহীতোষকে যে কি দিয়া অভ্যর্থনা আর আদর-যত্ন করিবে ভাবিয়া পায় না। শেষে, একরাশ বাজারের খাবার আনাইয়া তাকে খাইতে দেয় আর খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাড়ীর সব খবর জিজ্ঞাসা করে। ক'দিন আর সে বাড়ী ছাড়িয়াছে, ক'দিনের মধ্যেই কতগুলি বছর যেন কাবার হইয়াছে। জবাব দিতে দিতে মহীতোষ বিব্রত আর বিরক্ত হইয়া বলে, 'সবাই ভাল আছে, সব ঠিক' আছে। যেমন ছিল তেমনি সব আছে। কেন ভাবছিস?'

যেমন ছিল সব তেমনি আছে? সে চলিয়া আসার জন্য এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই? কাঁদাকাটাও করে নাই কেউ? যোগমায়া নিজেই দুঃখে অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

আরও বেশী বিব্রত হইয়া ঘণ্টাখানেক বসিয়াই মহীতোষ উঠিয়া পড়ে।

যোগমায়া কান্না থামাইয়া আবদার জানায়: 'রোজ একবার করে' এসো কিন্তু দাদা।'

'আসব।'

মেয়ের খোঁজখবর নিতে সকলকে বারণ করিয়াছে? মেয়ে-জামাইকে ঘরে ফিরানোর চেষ্টাটা সত্যপ্রিয়ের দিক হইতে আরম্ভ হইবে এটা বোধ হয় তবে আর আশা করা যায় না। আশা কি যশোদা করিয়াছিল? যশোদা নিজেই জানে না। মেয়ে-জামাই অন্য কোথাও গেলে হয়তো সত্যপ্রিয় কিছু করিত, তারা যশোদার বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সে গুম্ খাইয়া গিয়াছে। এবং হয়তো গুম্ খাইয়াই থাকিবে। অথবা হয়তো এমন কিছু করিবে যাতে মেয়ে-জামাই তার যশোদার বাড়ী ছাড়িয়া তার পায়ের উপর গিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িবে আর যশোদার হইবে সর্ব্বনাশ। কিভাবে এটা করা সম্ভব যশোদা ভাবিয়া না পাক, সত্যপ্রিয়ের মাথায় ওরকম অনেক মতলব আসা সম্ভব। কিন্তু আগে মেয়ে জামাই-এর একটা ব্যবস্থা না করিয়া সে কি যশোদার কিছু করিবে? কে জানে, হয়তো যার উপর রাগ হইয়াছে তাকে পিষিয়া মারার জন্য মেয়ে-জামাই-এর ভাল-মন্দের কথাটাও সে ভাবিবে না। মেয়ে-জামাইকেই হয়তো পিষিয়া মারার কাজে ব্যবহার করিবে। ওদের উপরেও তো সে কম রাগে নাই!

যশোদার মনটা একটু খারাপ হইয়া থাকে। আবার সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল? একটা তুচ্ছ বাজে উপলক্ষে? আদর্শবাদের ব্যাপারটা যশোদা একেবারেই বোঝে না, তবু তার সহজবুদ্ধিতেই সে বুঝিতে পারে, এবারকার লড়াইটা একেবারে অর্থহীন, জগতে কারও এতে কোন

উপকার হইবে না।

যোগমায়ার মনটা খারাপ হইয়া থাকে বীভৎস রকমের। তার রকম-সকম দেখিয়া যশোদাও ভড়কাইয়া যায়। কোন বিষয়ে ভড়কাইয়া যাওয়া যশোদার বড় অপছন্দ। বিরক্ত হইয়া যোগমায়াকে একবার সে আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিল, তারপর অনেক আদর করিল, তারপর নিজের বিষাদের স্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলার মত মাথা ঝাঁকি দিয়া বলিল, 'কি মন খারাপ করে' আছি আমরা সবাই মিছিমিছি! বাড়ীতে যেন মড়া জমেছে ক'গণ্ডা। এসো তো বাছা সবাই মিলে একটু ফুর্ত্তি করি আজ। কি করা যায় বল তো?'

সুব্রতাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, 'সিনেমায় যাবে দিদি সবাই মিলে?'

সিনেমা-থিয়েটার যাওয়া ছাড়া ফুর্ত্তি করার আর কোন উপায়ের কথা সুব্রতার জানা আছে কিনা সন্দেহ।

যশোদা না ভাবিয়াই বলিল, 'তাই চল।'

সহরতলীতে থাকিয়াও কতকাল যশোদা সিনেমায় যায় নাই তার নিজেরও মনে নাই। নন্দ আর সুবর্ণকে পর্দ্দায় দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছাটা আজকাল জোরালো হইয়া উঠিয়াছিল, যাই-যাই করিয়াও এতদিন যাওয়া হয় নাই। ভাবপ্রবণতার ব্যাকুলতাকে যশোদা বড় ভয় করে। নন্দকে পর্দ্দায় নড়িয়া-চড়িয়া কথা বলিতে দেখিলে আর তার গান শুনিলে হয়তো সে ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাটা যশোদাকে আটকাইয়া গিয়াছিল। সাধ করিয়া ওরকম ব্যাকুল হইয়া লাভ কি—ও তো মদ খাইয়া মাতাল হওয়ার সামিল!

আজ সে সুব্রতাকে বলিল, 'সেই ছবিটা দেখতে যাব—সেই যে সেদিন দেখে এসে আমায় বল্লে, একটা ছেলে চমৎকার গান গায়?'

সুব্রতা বলিল, 'সেটা তো আমি দেখেছি? একটা নতুন বই হচ্ছে, খুব ভাল বই, সেটা দেখব চল।'

ক্রমশঃ

কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

অকস্মাৎ শৈলজানন্দের কথাসাহিত্য লইয়া মাতিয়া উঠিলাম কেন, তাহার সামান্য কৈফিয়ৎ আছে। শৈলজানন্দের গল্প ভালো লাগে, মাঝে মাঝে অন্যান্য আধুনিক গল্প লেখকের নামের সঙ্গে শৈলজানন্দের নামও উচ্চারিত হইতে শুনি। অন্যের মুখেও প্রশংসা শুনি, শৈলজানন্দের গল্পে কি আছে এবং কি নাই—ইহা লইয়া আলোচনা সাহিত্য-বৈঠকাদিতেও হয়। কিন্তু এ-প্রকার বৈঠকী আলোচনা এবং অমুকের গল্প ভালো লাগে বলিয়া নিমীলিত নেত্রে বসিয়া থাকা—সাহিত্যরস-সম্ভোগের এ প্রকার তৃতীয় অবস্থার একটু উর্দ্ধে না উঠিলে কলম ধরিতে ইচ্ছা করে না। আমার মনে হয়, শক্তিমান্ আধুনিক কবি বা কথাশিল্পী সম্বন্ধে ভাবিবার এবং ভাবাইবার দিন আসিয়াছে।

শৈলজানন্দের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত। যখন একত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাঁহার নূতন লেখা গল্প বা উপন্যাস লইয়া নানা আলোচনা করিয়াছি, তখন তাঁহার সৃষ্ট কথাসাহিত্য লইয়া প্রবন্ধাকারে আলোচনা করিতে তেমন ইচ্ছা হয় নাই। বোধহয় দূরত্ব বা ব্যবধান আমাদের চিন্তাশক্তিকে জাগাইয়া দেয়, বন্ধুত্বের বা প্রীতির সম্বন্ধে যেখানে দূরত্ব বা ব্যবধান আসে সেখানে সেই ব্যবধানকে ভরাইয়া তুলিবার জন্য আমাদের কল্পনা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। আজ আমারও তাহাই হইয়াছে। শৈলজানন্দের গল্প ইদানীং বড়দিন পড়ি নাই। সেদিন হঠাৎ একখানি ছিন্নপত্র পুরাতন গল্পের বই হাতে আসিল। বইখানির নাম "দিনমজুর"—শৈলজানন্দের রচনা। ট্রেণে কলিকাতা আসিবার সময় বইখানি সঙ্গে আনিলাম। সারা রাস্তা ধরিয়া ট্রেণের ঝক্‌ঝক্ ধ্বনির মধ্যে, অবিশ্রাম যাত্রীদের সোরগোলে এবং উচ্চ কোলাহলের মধ্যেও বইখানি পড়িয়া শেষ করিলাম। 'দিনমজুরে'র গল্পগুলির মধ্যে শেষ গল্পটি অধুনালুপ্ত 'কালিকলম' পত্রিকায় পূর্ব্বে পড়িয়া ছিলাম। তাহার প্রথম লাইনটি আজও আমার মনে আছে। 'আজ ফাগুনের বাহা পরব, জোহানের বিহা হইবে।' শৈলজানন্দ এই জোহান নামটির অদলবদল ঘটাইয়াছেন, জোহানের নূতন করিয়া কি নাম যে তিনি রাখিয়াছেন, তাহা হঠাৎ মনে পড়িতেছে না। তবে গল্পটি দেখিলাম, অবিকৃত রহিয়াছে। আরও যে-সব গল্প 'দিনমজুরে' পড়িলাম, তাহা পূর্ব্বে পড়ি নাই। সুতরাং সেগুলি নূতন বলিয়া মনে হইল।

সাধারণত ছোট গল্পের বই পড়িতে গেলে আমার বড় মুস্কিল হয়। প্রথম গল্পটি পড়িবার পর নূতন করিয়া আবার আর একটি গল্প পড়িতে ইচ্ছা হয় না। দেখিলাম, 'দিনমজুরে'র সে আকর্ষণী আছে। প্রথম গল্প শেষ হইলেও থামিতে ইচ্ছা করে না, একের পর এক সমস্ত গল্পগুলি না পড়িলে নিস্তার নাই। ইহার কারণ, 'দিনমজুর' শৈলজানন্দের একেবারে নূতন সৃষ্টি। ইহার কথাবস্তুও নূতন, গল্পের পরিবেশ, ঘটনা-সংস্থান—এবং যাহাদের লইয়া গল্প, সেই অখ্যাত, অবজ্ঞেয় সাঁওতাল কুলী কামিনের দল, তাহারাও বাংলা সাহিত্যের সিংহদ্বারে একেবারে নবাগত। বঙ্কিমচন্দ্র

হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—ইঁহাদের মহিমান্বিত সৃষ্টিতেও ইহাদের দেখা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' এবং 'দিনমজুরে'র মত বই-এর জুড়ি নাই। ইহারা আপনাদের দীপ্তিতে স্বয়ম্প্রকাশ।

অনেক সময় কথাসাহিত্য শুধু সৃষ্টির উল্লাসেই রচিত হয় না। তাহার পশ্চাতে লেখকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য কাজ করে। হয়ত সমাজসংস্কার, বা আত্মগত কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লেখকেরা গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁহাদের আত্মপ্রবঞ্চনা ধরা পড়ে। শৈলজানন্দের গল্পে এমন কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিচয় পাই নাই। তাঁহার গল্পে শিল্পী এবং স্রষ্টা শৈলজানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হই। এই ভাবিয়া আনন্দিত হই যে, লেখক যাহাদের কথা আমাদিগকে শুনাইতেছেন, তাহাদিগের চিন্তায় তিনি তন্ময়। তাহাদের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, তাহাদের সামাজিক এবং সাংসারিক সংস্থান, তাহাদের অবস্থা এবং অবস্থান, তাহাদের উৎসব, তাহাদের ভাষণ, তাহাদের আনন্দ যেন তিনি নিজের বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং অতি অক্লেশে তাহাদের সেই সুখদুঃখ আনন্দবেদনাময় প্রাণধারার কাহিনী আমাদের শুনাইয়াছেন। সুবিধা এবং সুযোগ পাইলেও এমন খুঁটাইয়া দেখার শক্তি সকলের থাকে না। তাঁহার লেখা পড়িলেই মনে হয়, তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা যে আনন্দ তাঁহাকে দিয়াছে, তাহাকেই রসায়িত করিয়া তিনি তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই কোথাও ফাঁকি আছে বলিয়া মনে হয় না।

শৈলজানন্দের উচ্চশ্রেণীর গল্প অনেক আছে। তাহাতে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অনেক অশ্রুসজল করুণ কাহিনী আছে। সে সকল গল্প লইয়া আজ আলোচনা করিতেছি না। তাঁহার 'দিনমজুর' বা ঐ জাতীয় বই কোথায় কোথায় আমার মন স্পর্শ করিয়াছে, তাহারই সন্ধান করিতেছি। সাহিত্য সমালোচকেরা অনেক খাঁটিয়া অনেক খাটিয়া ছোটগল্পের নানা সংজ্ঞা দিয়াছেন। সেই সব সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে তাঁহাদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ-সবের বহু উর্দ্ধে চলে প্রতিভার কাজ। সে মুহূর্ত্তে ইন্দ্রজাল রচনা করে, মুহূর্ত্তে সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে আপনার ক্ষমতাবলে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয়। কথাশিল্পী শৈলজানন্দের 'দিনমজুর'জাতীয় গ্রন্থে তাঁহার এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে-শক্তি মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিবার শক্তি বা ভরসা আনিয়া দেয়, শৈলজানন্দের সে-শক্তি আছে এবং অশিক্ষিত, দরিদ্র, সাহসী, স্বাধীনচেতা সাঁওতাল কুলীমজুর এবং কুলীকামিনরা যেন তাঁহার লেখনীর মুখে প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আমি ভাবিতেছিলাম, যদি কোনোদিন এই সব সাঁওতালরা সুশিক্ষিত হয় (হয়ত কেহ কেহ হইয়াছে, জানি না), আর যদি তাহারা বাংলা ভাষার সৌন্দর্য্য এবং রস আহরণে যত্নশীল হয়, তাহা হইলে তাহারা শৈলজানন্দের এই গল্পগুলির মধ্যে কি পাইবে ? তাহারা যাহা পাইবে, তাহাদের দেবতা-ও হয়ত তাহা কোনোদিন তাহাদিগকে দিতে পারিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আমার এমনও মনে হইতেছিল, যে, শৈলজানন্দ কোন বাঙালী সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, নিরক্ষর চাষাভুষোর

মধ্যে এই জীবনের স্পন্দন অনুভব করেন নাই? এমন সুযোগ কি তাঁহার হয় নাই? ভাবীকালের সাহিত্যে তাহাদের কথাই আরো বেশী করিয়া বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের এমন দিন আসুক, যেদিন Tolstoy-এর মত সাহিত্য-প্রতিভার প্রয়োজন। শুধু সাঁওতাল নয়, যাহারা মাটি চষিয়া অন্নসংস্থান করে, সমগ্রভাবে তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খার কথা সেই প্রতিভার বাণীতে প্রাণস্পন্দিত হইয়া উঠিবে।

'দিনমজুরে'র গল্পগুলি আকারে বেশী বড় নয়। ছোট। অনেক সময়ে আকারে বড় গল্পকেও ছোটগল্প বলা চলে। ইহা নির্ভর করে, কি ভাবে সে গল্প লেখা হইয়াছে, তাহার উপর। শৈলজানন্দের আকারে বড় এমন অনেক গল্পকে ছোটগল্প বলা চলে। যেমন "অতি ঘরস্থী না পায় ঘর", "নারীমেধ", "নন্দিনী" প্রভৃতি। আকারে বড় হইলেও ইহাদের গঠনভঙ্গী ছোটগল্পের।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃত সাহিত্যে ছোটগল্প আছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ এবং বিষ্ণুপুরাণের ছোট ছোট গল্পগুলি। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' এবং 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ছোটগল্প বলা চলে কি না জানি না। আমার মনে হয়, তাহাদিগকে ছোটগল্প বলা চলে না। 'রাধারাণী' এবং 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে শুধু আকার কেন, গঠনভঙ্গীর দিক্ দিয়া দেখিলে উপন্যাস-ই বলিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-ই রচনা করিয়া গিয়াছেন, ছোটগল্প তাঁহার হাত দিয়া বাহির হয় নাই। রবীন্দ্রনাথই ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে প্রথম আনিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরে যাঁহারা বাংলা ছোটগল্প রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভাতকুমারের নাম সর্বপ্রথমে মনে আসে। তাঁহার ছোট গল্পগুলি অনবদ্য। ভাষায় আড়ম্বর নাই, অথচ প্রবাহ আছে। ভঙ্গীও সংযত। শুধু গল্প বলার আনন্দে তিনি গল্প বলিয়া গিয়াছেন। কোথাও কোন Propaganda বা কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা তাঁহার গল্পগুলিকে খর্ব্ব করে নাই। ইঁহাদের পর ছোটগল্পে অনেক বৈচিত্র্য আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি —এই নামগুলি মনে আসিল। ইঁহাদের প্রত্যেকের ভঙ্গী স্বতন্ত্র, বিচার বা আলোচনা করিতে হইলে এক এক জনের সাহিত্যসৃষ্টি লইয়া বিচার করা উচিত। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভব নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক শৈলজানন্দ, মনীন্দ্রলাল, বিভূতিভূষণ প্রভৃতির নাম মনে পড়ে। ইঁহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র, বিষয়বস্তু এবং গল্পের গঠনভঙ্গীও স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যময়। শৈলজানন্দের কথাই আলোচ্য।

শৈলজানন্দের রচনার সংযম আমার মন স্পর্শ করে। আমি Style বা রচনারীতির সংযম বলিতেছি। বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় সংযম নহে—সে-সংযমের জন্য শৈলজানন্দকে শিল্পী বলিতে ইচ্ছা করে। ভাবালুতা বা ভাবোচ্ছ্বাস অনেক সময়ে গল্পের অঙ্গহানি ঘটায়। শৈলজানন্দের গল্পে তাহা পাই না। তিনি আপনাকে অর্থাৎ অন্তরের প্রগল্‌ভতালোলুপ কবিকে দূরে সরাইয়া গল্প লিখিয়াছেন। তাই সেগুলি নিছক খাঁটি গল্প হইয়া উঠিয়াছে—কবিতা হয় নাই। অনেক সময়ে গল্প এবং কবিতা মিশিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর গল্প অনেক আছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে'

প্রভৃতি গল্পে কবিতা আছে। গল্পাংশ কম হইলেও তাহাদের ক্ষুরধার প্রবাহ আমাদের অন্তরাত্মাকে ছিন্নভিন্ন করে, টানিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। কল্পনার এই মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা মুক্তি পায়। এই জন্য এগুলিকে উচ্চাঙ্গের কবিকৃতি বলিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু একটি ছোটগল্পকে যদি ক্ষুদ্র একটি নাটক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়—এক দিনের এক নিমেষের একটি তুচ্ছ ঘটনা, যাহা তুমি আমি—আমরা নিত্যনিয়ত দেখি, উপেক্ষা করি, ভুলিয়া যাই, তাহাই যদি পাত্র পাত্রী বা নায়ক নায়িকার সহযোগে শিল্পীর তুলিকাপাতে রূপবান এবং সার্থক হইয়া উঠে, তাহা হইলে কেমন হয়। বোধ হয় ইহাই ছোট গল্পের রূপ। এবং এই রূপ শৈলজানন্দ তাঁহার ছোটগল্পে দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেই অতিসংক্ষিপ্ত নাটকীয় রূপের মধ্যে কবিপ্রাণ যদি জাগিয়া উঠে, তাহাতে ক্ষতি কি? শৈলজানন্দের এই কবিপ্রাণ তাহার ভাব ও ভাষার ঝঙ্কার লইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক গল্পে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বধূবরণে'র নাম করিতে পারি। 'বধূবরণে'কে রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছের" যে কোনো শ্রেষ্ঠ গল্পের পাশে স্থান দিতে ইচ্ছা করে।

এখন শৈলজানন্দের রচনায় সংযমের কথা বলি। 'নারীমেধ' পড়িতে পড়িতে আমার Thomas Hardy-র রচনাভঙ্গীর কথা মনে পড়িয়াছিল। Hardy-র অধিকাংশ উপন্যাসই বিয়োগান্ত বা Tragedy. তাঁহার উপন্যাসগুলির ঘটনাস্রোত যেন দুর্নিবার গতিতে করুণ নৈরাশ্যময় অবসান ও হাহাকারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। রচনাভঙ্গী অতিসংযত, কোথাও ভাবোচ্ছ্বাস বা বর্ণনভঙ্গীর আতিশয্য মনকে পীড়া দিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। উপন্যাস পড়িতে বসিলেই প্রথম হইতেই যাহা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং একেবারে শেষে কি হইল জানিবার জন্য অদম্য কৌতূহল আনে, সেই ভাষা বা ভঙ্গীই লক্ষ্য করিবার বস্তু। Hardy-র ভাষায় এই আকর্ষণী আছে। তাঁহার গ্রন্থগুলির মূলতত্ত্ব বা দর্শনের দিক্ দিয়া আমি আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি সেই ভঙ্গীর কথা এবং আকর্ষণীর কথা বলিতেছি, যাহা একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পাঠকচিত্তকে সজাগ এবং রসোন্মুখী করিয়া রাখে এবং গ্রন্থ Tragedy-তে পর্য্যবসিত হইলেও পাঠককে তাহা আনন্দই দেয়। Tragedy-র আনন্দ কি, তাহার সূক্ষ্মবিচার করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। শৈলজানন্দের "নারীমেধ" প্রভৃতি গল্পে এই ধরণের আকর্ষণী আছে এবং রচনায় সংযম আছে বলিয়াই এইশ্রেণীর গল্পগুলি ভালো উৎরাইয়াছে। শৈলজানন্দের গল্পোপন্যাসও অধিকাংশই Tragedy. তাঁহার 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', 'নীহারিকা ওরাচ্ কোম্পানী', 'বানভাসি' প্রভৃতির মধ্যেও বীরত্বের রুক্ষ, ধূলিধূসর মাঠ, নিষ্করুণ দারিদ্র্য, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের চরিত্র, তাহাদের বিপদ বিসম্বাদ এবং পরিণামে ধ্বংসের কাহিনী বেশ সুন্দরভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। তিনি যে কথা সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভয়ানক, বীভৎস এবং করুণ রসের প্রাধান্যই বেশী।

বাংলা কথাসাহিত্যে এখনও যেন তাঁহার দিবার অনেক কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। অনেকবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, এইবার একখানি 'এপিক জাতীয়' উপন্যাসে হাত দিব। কৈ, শৈলজানন্দ সেদিকে অগ্রসর হইলেন কৈ?

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একটু আগে প্রাতরাশ শেষ হ'য়েছে। একদল মেয়ে ওপরে চলে' গেছে আর একদল সংবাদপত্রের 'সাধারণ-বুদ্ধির কাছে হিটলারের শেষ আবেদন' নিয়ে একটু সমস্ত হ'য়ে পড়েছে—প্রতিমা 'পিরানদেলো'র একটা গল্প অনুবাদ করার চেষ্টা করছিল অনেক দিন থেকে কিন্তু দু'এক লাইন ছাড়া অগ্রসর হ'তে পারে নি। প্রায়ই একটা না একটা উপদ্রব আছেই। ডাইনিং-হলটা নির্জ্জন ভেবে সে নীচে এসেছিল—অনেক চেষ্টা করে' একটা লাইনও লিখ্‌তে না পেরে বইটা রেখে একটা অস্ফুট শব্দ করে' উঠে দাঁড়াল। মণিকা তার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লে, 'Poor dear!' প্রতিমা একটুও লজ্জিত না হ'য়ে বল্‌লে, 'আমি জান্‌তাম আমার দ্বারা এ হবে না।'

'জয়ন্তবাবুর কাছে কেন মিথ্যে কথা দিয়ে এলি?' মণিকা বল্‌লে।

'বা রে, কথা কি আমি দিয়েছি নাকি? কথা ত আমার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে—ইউনিভার্সিটির অতগুলো ছেলে প্রায় একসঙ্গে Common room raid করার মত—আমি 'না' বলি কি করে?'

রাণু কাগজ-পেন্সিলে মার্শাল গোয়েরিং-এর একটা sketch করছিল, প্রতিমার হাত থেকে পেনটা টেনে নিয়ে সনিশ্বাসে বল্‌লে, 'না বল্‌লে যে vanityতে বাধ্‌তো।'

রমা Statesman থেকে মুখ তুলে একটু কটাক্ষ করে' বল্‌লে, 'তাছাড়া পাব্‌লিসিটির এত বড় সুযোগ!'

'কৃষ্ণা ছাড়া আর কারও পাব্‌লিসিটি জয়ন্তর চোখে পড়্‌বে ভেবেছ?' মণিকা বল্‌লে।

'But the wheel may turn, আমরা হিটলারের মত গ্রহ-তারকায় বিশ্বাস করি।' রাণু অসমাপ্ত sketchটা একবার চোখের সাম্‌নে তুলে ধরে' নামিয়ে রেখে গম্ভীরভাবে কথাটা বল্‌লে।

'কৃষ্ণা কিন্তু বেশ প্র্যাক্‌টিক্যাল সুগৃহিনী হ'তে পার্‌বে।' মণিকা বল্‌লে।

'কথাটা কিন্তু আফশোষের মত শোনালো মণিদি।' রাণু ছবিটা শেষ করে' উঠে দাঁড়াল।

'আফশোষ আমার জন্যে নয় রাণু—তোমাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধেও ঠিক optimist হ'তে পারছিনা।' মণিকা খোঁচাটা ফিরিয়ে দিলে।

'তাই বলে' কৃষ্ণার মত তুমি exploit করতে বলো—flirt করে' এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানো—কাল রাত্রে হস্‌টেলে পর্য্যন্ত ফেরেনি—সে-খবর রাখো?' ইন্দিরা এতক্ষণ কোন কথা বলে নি—এইবার বিজ্ঞের মত যথেষ্ট জোর দিয়ে কথাটা বলে' একটু নড়ে' বস্‌লো।

কিন্তু কেউই এতক্ষণ এক দিকে লক্ষ্য করে' দেখেনি।

(প্রতিমা অনেক আগেই সচেতন হ'য়ে চুপ করে' গিয়েছিল) নির্ব্বাক বিস্ময়ে সকলে

হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইলো—সিঁড়ির হাতলের উপর ভর দিয়ে মর্ম্মর মূর্ত্তির মত কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই—চুলগুলো রুক্ষ, ঘড়ের নীচে এলোমেলো ভাবে নেমে এসেছে। কখন যে সে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে কেউই তা টের পায় নি।

দুর্ব্বল দেহে এতটা পথ হেঁটে কৃষ্ণা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। এখন একটু বিশ্রাম করতে পেলে সে বেঁচে যায়। কাল রাতে ভাল করে' সে ঘুমুতে পারে নি, শুধু শেষরাতে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। কৃষ্ণা কোনমতে উপরে উঠে এলো, কিন্তু দরজায় তালা বন্ধ দেখে সে বিস্মিত হ'লো। এত ভোরে মণিকা কোনদিনই বের হয় না, বিশেষ করে' আজ ছুটির দিন। কিছুক্ষণের জন্য কি ভেবে কৃষ্ণা নীচে এলো—চায়ের টেবিলের কূজন তখনও শেষ হয় নি। কৃষ্ণা অনায়াসে ভিতরে যেতে পারতো কিন্তু চাপা কণ্ঠস্বরে তার সম্বন্ধে কি যেন আলোচনা হ'চ্ছে সে টের পেলো। পা দু'টো পাথরের মত নিশ্চল, আর কোন উৎসাহ নেই তার; একবার মনে করলে, সে যেন কিছু শুন্‌তে পায় নি এমনি একটা ভাণ করে' চুকে পড়বে সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সাম্‌নে—বেশ নাটকীয় একটা উপস্থিতি। কিন্তু না, এসব হাল্‌কা জিনিষ আর ভাল লাগে না—কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। দরজার পর্দ্দাটা বাতাসে ফাঁক হ'য়ে সরে' যাচ্ছে। মণিকা বেরিয়ে এসে লজ্জিতভাবে বল্‌লে, 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছো বোধ হয়?' চাবিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হ'য়ে কৃষ্ণা বল্‌লে, 'না'।

'কাল অনেকরাত পর্য্যন্ত দরজা খোলা ছিল—ভেবেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত তুমি আস্‌বে।'

'অনেক ধন্যবাদ মণিদি।' কৃষ্ণা দ্রুত পায়ে উপরে উঠে এলো। সমস্ত শরীর তার কাঁপছিল। কোনমতে একটা চাদর টেনে নিয়ে ক্লান্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে একটা বালিশ বুকের কাছে শক্ত করে' চেপে ধর্‌লো। এখন সে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেতে চায়, আঁধার মত ঘুম তার চোখে লেগে রয়েছে।

অথচ আশ্চর্য্য, চেষ্টা করেও কৃষ্ণা ভুল্‌তে পারছে না, মিসেস দে দৃপ্ত ভঙ্গীতে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এখনও যেন জেরা করছেন।

সার্সিটা শব্দ করে' খুলে দিয়ে প্রতিমা বল্‌লে, 'শুনেছ বোধ হয়!'

কৃষ্ণা একবার চোখ মেলে তাকাল, তারপর পাশ ফিরে দুর্ব্বল কণ্ঠে বল্‌লে, 'না?'

'তুমি কিছু বলো না বলেই ত ওরা প্রশ্রয় পায়। আজ মণিদির সঙ্গে ইন্দিরাকেও যোগ দিতে দেখ্‌লাম। সত্যি, হস্‌টেলে কি আমরা বন্দী নাকি? আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না?' প্রতিমার কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। একটু থেমে আবার বল্‌লে, 'কাল রাতে তুমি আসোনি বলে' ওরা এমন vulgar wayতে কথা বল্‌ছিল!—তুমি বলেই তা সহ্য করে' যাও!' চেয়ারে একটা শব্দ করে' প্রতিমা উঠে দাঁড়াল।

'আমি গান্ধীবাদে বিশ্বাস করি প্রতিমা।' চোখ না খুলেই কৃষ্ণা কথাটা বল্‌লে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেল। একটু পরে আবার বল্‌লে, 'কোন-কিছুতে প্রতিবাদ করার মত সাহস আর আমার নেই।' কৃষ্ণা এইবার চোখ মেলে তাকালো। প্রতিমা কাছে সরে' এসে কপালে হাত রেখে বললে,' তোমার অসুখ করেছে কৃষ্ণা।'

'না, ও কিছু নয়।' নির্ব্বিকার কণ্ঠে কৃষ্ণা বল্‌লে।

'যাই ভাই—মণিদি এখুনি এসে পড়্‌বে।' প্রতিমা কৃষ্ণার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে' দিতে দিতে বল্‌লে।

'মণিদিকে বুঝি তুই ভয় করিস্?' একটু হেসে কৃষ্ণা বল্‌লে।

'তা কেন? ওর ধারণা, আমি বুঝি সব কথা তোমার কাছে বলে' দিই—একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে' যাবো?' প্রতিমা সশব্দে খানিকটা হেসে উঠে দাঁড়াল।

দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'একটা কথা তোমায় বল্‌বো কৃষ্ণাদি—যদি রাগ না করো।'

'কথা না বলার ভূমিকা আমার ভাল লাগে কিন্তু সত্যি যখন কথা থাকে ভূমিকা বাদ দিয়েই আমি তা শুনতে চাই—' কৃষ্ণা বালিশে হেলান দিয়ে মাথাটা একটু তুলে বল্‌লে।

'সত্যি, এমন মুস্কিলে পড়েছি—জয়ন্তবাবু একটা লেখা চেয়েছিলেন,—কিছুতেই আর হয়ে উঠ্‌ছেনা। তোমার প্রবন্ধটা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে?'

'এখনও আরম্ভই করিনি।' কথাটা শুনে প্রতিমা যদিও মনে মনে একটু খুসী হলো তবু বল্‌লে, 'বলো কি? জয়ন্তবাবু এত আশা করে' থাক্‌বেন! তোমার সঙ্গে কি তাঁর দেখা হয়েছিল?' প্রতিমা উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ—তাকে নিরাশ হ'তে বলেছি।' কৃষ্ণা চাদরটা বুক পর্য্যন্ত টেনে নিলে। কথা বল্‌তে তার আর ভাল লাগ্‌ছিল না।

শেষ পর্য্যন্ত যদি কিছু হয়ে না ওঠে, প্রতিমা ভাব্‌লে, কীট্‌স-এর 'হেলেনিজম্' সম্বন্ধে পাতা দুই লিখে নিলেই চল্‌বে কিম্বা সপ্তদশ শতাব্দীর কবিতা—প্রফেসার সেনকে দিয়ে নাহয় correct করিয়ে নেবে।

প্রতিমা অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে ফিরে গেল।

মেয়েদের আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ছুটির দিনে কে আর চুপ করে' বসে' থাকে! যে যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে। শুধু ইন্দিরার ঘর থেকে এটা-ওটা নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একরাশ বই মেঝেতে ছড়ানো, তারই একপাশে ইন্দিরা স্থাণুর মত বসে' আছে। সমস্ত বই তার উঁইপোকায় নষ্ট করে' দিয়েছে—এতদিনের দামী অ্যালবামটার চিহ্নমাত্র নেই। সুটকেশের তলাটা প্রায় অর্দ্ধেক খসে' পড়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে ইন্দিরা উঠে দাঁড়াল।

ওপর থেকে শাড়ীগুলো আলগোছে তুলে নিয়ে এঘরে এলো—মণিকার আলমারীটা খোলাই থাকে, ইন্দিরা সে-কথা জান্‌তো।

পায়ের শব্দে চকিত হ'য়ে কৃষ্ণা চোখ মেলে তাকাল।

'জানালাটা একটু খুলে দাও ইন্দিরা—বেলা বোধহয় শেষ হয়ে এলো।' কৃষ্ণা দুটো আঙুলে কপালটা চেপে ধরে' বল্‌লে।

কাজ শেষ করে' ইন্দিরা চলে' যাচ্ছিল, কৃষ্ণার ডাকে ফিরে দাঁড়াল: 'র‍্যাগটা একটু টেনে

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

দেবে—এত শীত করছে আমার।'

একটু পরে ইন্দিরা চলে' গেল—আবার তেমনি নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো।

বিগত দিনের স্মৃতি ক্রমশঃ ধূসর হ'য়ে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যায়। কিন্তু জীবনে এমন সব মুহূর্ত্ত আসে যা সমস্ত সত্তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়, যাকে কেন্দ্র করে' মানুষ ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সৌধ গড়ে' তোলে আর পৃথিবীকে নতুন করে' ভালবাসতে আরম্ভ করে।

কৃষ্ণার মনে পড়লো, আর বছর এ রকম সময়েই হবে হয়ত, সে কিছুদিনের জন্যে ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল। বিশেষ কিছুই নয়, এমনি যায় নি—রমলা তখন প্রায়ই আসতো।

স্তব্ধ দুপুর। শেলির প্রমিথিউসখানা হাতে নিয়ে কৃষ্ণা শিথিল ভঙ্গীতে একটু এলোমেলো ভাবে শুয়ে আছে। হঠাৎ জয়ন্তকে প্রবেশ করতে দেখে সে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লো। আল্‌না থেকে রাউজটা কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, 'কী দুষ্টু তুমি! একেবারে ওপরে উঠে এসেছ?'

'Excuse me,' আমি প্রায়ই ভুলে যাই এটা মেয়েদের হস্টেল।' জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বল্‌লে।

'সুবিধে মত এ রকম ভুল মন্দ লাগে না—কি বলো?' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংস্কৃত করে' নিয়ে কৃষ্ণা ভিজিটিংরুমে এলো। জয়ন্ত কোন কথা না বলে' তাকে অনুসরণ করলে মাত্র।

একটু পরে কৃষ্ণা আরম্ভ করলে, 'তারপর, ক্লাশ পালিয়েছ নিশ্চয়ই?'

'আমার ইচ্ছা ছিল না, ক্লাসে ওরা আমায় থাকতে দিলে না—জোর করে' তোমার খবর নিতে পাঠাল।'

'যাও।' কৃষ্ণা একটা কটাক্ষ করে' মুখ ফেরাল।

'বিশ্বাস হলো না বুঝি? Inferiority complex' জয়ন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্‌লে।

'এখন কি করতে চাও শুনি?' কৃষ্ণা গম্ভীর গলায় বল্‌লে।

'করতে চাই অনেক-কিছু—উপস্থিত তোমাকে নিয়ে আলিপুর যাবো ভাব্‌ছি।'

'হঠাৎ এ সময় আলিপুরে কেন?'

'অনেকদিন থেকে বাঘ দেখার সখ হয়েছে।'

'যাও, ছেলেমানুষি নয়—সত্যি বলো।'

'বেশ ত আমি চুপ করছি—তুমিই ঠিক করে' ফেল।'

'বিকেলের দিকে রমলাদের ওখানে একবার যাবার কথা আছে। আমি ত engaged জয়ন্ত।' কৃষ্ণা চাবির চেন্‌টা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বল্‌লে।

'না, তোমার সেখানে যাওয়া হবে না।' জয়ন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে।

'কেন বলো ত! রমলা প্রায়ই আসে, একবার তার খোঁজ নেবো না?'

'না।

'না কেন?' কৃষ্ণা একটু বিরক্তভাবে বল্‌লে।

'আমি বল্‌ছি।' জয়ন্ত তেমনি জোর দিয়ে বল্‌লে।

'কতদিন এ রকম ভাবে তোমার হুকুম আমায় মেনে চল্‌তে হবে বল্‌তে পারো?' কৃষ্ণা আবেদনের সুরে বল্‌লে।

'যতদিন না বিদ্রোহ করো।'

'বেশ আমি যাবো।' কৃষ্ণা একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিল।

তারপর দুজনেই চুপ, কেউই কোন কথা বলেনি।

শুধু জয়ন্ত যাবার সময় বলেছিল, 'এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা জলের পরিবর্ত্তে আইসক্রিম আর বরফ এনে দিয়েছিল। এবং চাকরকে দিয়ে এক বাক্স সিগারেটও আনিয়ে দিতে হয়েছিল তার পরে।

জয়ন্ত সেদিন চলে' গিয়েছিল নিঃশব্দে, আর কোন কথা বলেনি।

তারপর অনেকদিন পরে বাধ্য হয়ে কৃষ্ণাকে সন্ধি করতে হয়েছিল—জয়ন্তর জেদ সে জানতো।

অনেক উপদ্রবের ক্লান্তিনী কৃষ্ণার মনে আছে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, কৃষ্ণা প্রশ্রয় না দিয়ে পারতো না। দিনের পর দিন জয়ন্তর দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষ্ণা সব কিছু ভুলে যেত, সমস্ত দিন ধরে' একটি আকাঙ্খিত মুহূর্ত্তের প্রত্যাশায় উন্মুখ হ'য়ে থাকতো।

কত কথা সে মনে মনে সাজিয়ে রাখতো—জয়ন্ত এলে কোন-কিছুই তার বলা হতো না। শুধু ম্লান দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো, আর জয়ন্ত আপন খেয়ালে যখন যা খুসি বলে' যেত।

শরীর ক্রমশঃ-নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে। পা দু'টোয় যেন পাষাণ চাপা দেওয়া হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কৃষ্ণা আর তাকাতে পারছে না। দিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণা চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত যেন একাকার হ'য়ে মিশে যাচ্ছে। চীৎকার করে' কাউকে ডাক্‌তে চেষ্টা করলে—শুধু মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হ'লো মাত্র।

ক্রমশঃ

বর আসবে!

কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

রেলগাড়ী করে' বর আস্‌বে, বুঁচীর আনন্দের আর সীমা নেই—তাহ'লে শ্বশুরবাড়ী যাবে সে রেলগাড়ী চড়ে'!

আজও সে জীবনে রেলগাড়ী চড়েনি। প্রতি বছর চড়কডাঙ্গার মেলায় তারা হেঁটেই যায়, টিকিটের পয়সা কোথায় পাবে? সবুজের মখ্‌মল-বিছানো তেপান্তরের মাঠ, হাঁটু-জলে ধানের চারাগুলো লক্‌লক্ করে, তারই ভিতর দিয়ে রেলের রাস্তা চলে' গিয়েছে দিগন্তের এপার থেকে ওপারে, কোমল মেয়ের তুল্‌তুলে মাংসল দেহে শক্ত শিরদাঁড়ার মতন—দিনে কতবার সাঁই সাঁই রেলগাড়ী ছুটে যায়, সারা মাঠের বুক শিউরে শিউরে থর্ থর্ কাঁপে। আরও ছোটবেলা ছুটন্ত রেলগাড়ী দেখ্‌লে বুঁচীরও ভয়ে বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করে' কেঁপে উঠত—আজকাল আর ভয় করেনা, বরং রেলগাড়ী চাপ্‌তে সাধ যায়। সে বড় হ'য়েছে, কত সাধই না তার যায়, তারই মধ্যে এও একটা। রেলগাড়ী চেপে সে অনেক, অনেক দূরে চলে' যাবে।

বুঁচীর বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গিয়েছে, তার বর আস্‌বে।

আইন পাশ হ'য়ে অবধি চোদ্দ বছরের আগে তো আর মেয়ের বিয়ে দেবার জো' নেই, কে কোথায় শত্রুতা করবে। চোদ্দ বছর অবধি নিশ্চিন্ত থেকে তার বাবা বিয়ের চেষ্টা করছিলেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বয়স হ'য়ে গেল আঠারো—মনে মনে তার কত সাধ। বিয়ে হয়ে গেলে এরকম ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে তাকে আর পর্‌তে হবে না, বাড়ন্ত বুকের টানে পুরনো সেমিজ ছিঁড়ে যায়,—এর পরে বর কত নতুন সেমিজ কিনে এনে দেবে। মেলাগুলোয় ত' কতরকম সেমিজ বিক্রি করতে আসে, কত রকম ব্লাউজও, গোলাপী, সবুজ, আস্‌মানি, সব রকম রং-এর নামও যে সে ছাই জানে না! সাড়ীও কতরকম—ঝর্‌ঝরা, আরও কত কি!

বাবা বড় গরীব। চিরকালই গরীব। পাড়াগাঁয়ে আজকাল কারই বা অবস্থা ভাল? গাঁয়ের চাষাভূষোর যজ্‌মানি করে' যার অন্নসংস্থান করতে হয়, তার অবস্থা আর ভাল হবে কি করে'? তিন গাঁয়ের যজ্‌মান বাড়ী থেকে যা আসে, তাতে পেট চলে' যায় কোনরকমে, খড়োঘরের দেওয়ালে নতুন মাটি পড়েনি কত বছর, বর্ষায় চাল থেকে জলও পড়ে—ধানের শূন্য জালাটা বৃষ্টির জলেই ভরে' উঠ্‌তে চায়।

তায় আবার এ-বছর ইংরেজের দেশে যুদ্ধ বেধেছে—জিনিষপত্র দুর্‌মূল্য হ'য়ে উঠ্‌ছে, শহরের হাটে-বাজারে নোটের টাকাই নাকি মহাজনরা দিতে চায় না। নোটই কখনও হাতে আসে না, ভাঙাবার দুর্ভাবনার হাত তাই সহজেই এড়ানো গিয়েছে। যাই হোক্, এ দুর্‌মূল্যের বাজারে এ বছর মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে বুঁচীর বাপের ছিল না, তার বুড়ী ঠাকুমা আর তার মা ছাড়েনা কিছুতেই! "বুঁচীর বিয়ে দাও", "বুঁচীর বিয়ে দাও", বলে' রোজ কান্নাকাটা করে।

বুঁচীর পূর্ব-পুরুষেরা বুঝি কুলীন ছিলেন, কত মেয়ে আজন্ম আইবুড়ো থাক্‌ত তাঁদের বাড়ী—সৎকুলের পাত্র না পেলে কি আর মেয়ে দেওয়া যায়? অবস্থার ফেরে পিতামহের আমোল থেকেই কুলের বিচার আর তাঁদের নেই—কিন্তু মেয়েকে দিনকতক আইবুড়ো রাখ্‌তে দোষ কি? দুর্মূল্যের বাজারে মেয়ে পার-করা কি সোজা কথা? আইন করে' দিয়েছে—চোদ্দ-বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দিও না, কিন্তু চৌত্রিশের আগে বিয়ে দিতেই হবে, এ আইন তো হয় নি! বুঁচীর বয়স এই ত সবে আঠারো, আরও দিনকতক অপেক্ষা কর্‌লে দোষ কি!

বুঁচীর ঠাকুমা আর মা একজোট্ হয়েছে, কোন কথাই তারা শুন্‌তে চায় না। বলে, ব্রহ্মোত্তর-ধেনোজমির টুক্‌রোটুকু বেচেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বেশ, তাই হোক্। বুঁচীর বাবা ও-গাঁয়ের হেদায়েৎউল্লার কাছে ব্রহ্মোত্তর বাঁধা রেখে দু'কুড়ি টাকার জোগাড় করেছে, বাড়ন্ত-মেয়ে ঘরে নেবার মত পাত্রের তত অভাব হয় না, তার উপরে, বুঁচী দেখ্‌তে-শুন্‌তে খাসা মেয়ে। তাই বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ সহজেই হয়ে গেল।

তারা নেবে না কিছুই। শুধু বরযাত্রী আন্‌বার খরচটা দিতে হবে। শুধু রেলগাড়ীর টিকিট ভাড়া। বুঁচীর বাপ ব্রহ্মোত্তর ধেনোজমি বাঁধা দিয়ে দু'কুড়ি টাকা জোগাড় করেছে, তা' থেকে কি অল্প রেল ভাড়াটা দিতে পার্‌বে না? অবশ্য এদিকেরও কিছু খরচ আছে, বরযাত্রীদের খাওয়াতেও হবে,—এদিক ওদিক আরও কিছু খরচ হবে বৈকি। কিন্তু দু'কুড়ি টাকাটাও কি কম? পুরুতঠাকুর জীবনে কখনো দু'কুড়ি টাকা একসঙ্গে খরচ করে নি।

ও-সব অবান্তর কথা। বুঁচীর সাধ এতদিনে মিট্‌তে চলেছে। গ্রাম থেকে যে পথখানা মাঠের দিকে চলে' গিয়েছে সেটাই পার হয়েছে দূরে ওই রেলের রাস্তা, সেটা দিয়েই একেবেঁকে দু'ক্রোশ দূরে ইষ্টিশানে যাওয়া যায়। গাঁয়ের মধ্যে গয়লাদের অবস্থাই একটু ভাল, তারা দূর শহরে দুধ চালান দিয়ে যা' দু'পয়সার মুখ দেখ্‌তে পায়—গয়লা বাড়ীর ছেলেরা দু'একজন তাই ইংরিজি লেখাপড়া একটু শিখেছে, মাঝে মাঝে শহরে যাওয়া-আসাও করে। এই পথ ধ'রেই তাদের যাওয়া-আসা। ইংরেজের দেশের যুদ্ধের খবর তাদের মুখেই শোনা যায়। তারা কখনও কখনও খবরের কাগজ পড়ে কি না।

গয়লাদের ছেলের কাছে যুদ্ধের খবর শুনে এসে বুঁচীর বাপ সেদিন বলেছিল, এবারকার যুদ্ধে এরোপ্লেনের চলনটাই বেশী, বিদ্যুৎগতিতে উড়ে' এসে তারা দমাদম বোমা ফেলে চলে' যায়।

যুদ্ধের কাহিনী রামায়ণ মহাভারতে আছে, সেবার কথকঠাকুরের কথকতায় বুঁচী প্রায় রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের সমস্তটাই শুনেছিল, তারই সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সে ইংরেজের দেশের যুদ্ধের খবরটা বুঝ্‌তে চেষ্টা করে। এরোপ্লেন তো সেই পুষ্পকরথ, ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ কর্‌ত,—ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, শক্তিশেল!

রামচন্দ্র যুদ্ধ জয় করে' সীতাকে উদ্ধার ক'রেছিলেন, অযোধ্যায় ফিরে গিয়েছিলেন তিনি সীতাকে নিয়ে পুষ্পক রথে চড়ে'।

বুঁচীর বর তাকে বিয়ে করে' রেলগাড়ী চড়িয়ে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে—ভাবতে ভাবতে

বুঁচী আনন্দ আর বুকে ধরে' রাখ্‌তে পারছিল না। বড় লজ্জাও কর্‌ছিল তার, লজ্জায় তুল্‌তুলে গাল দুটী থেকে কানের পাশ অবধি রাঙা হয়ে উঠ্‌ছিল।

মনের কথা কেউ শুন্‌তে পায় না, ভারী সুবিধা। বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গিয়েছে, যে-সব কথা মনে আন্‌তে আগে ভারী লজ্জা করত, আজ সাহসিকা মেয়ে তাই ইচ্ছে করে' মনে আন্‌ছে, সে-সব কথা ভাব্‌তে ভারী মিষ্টি লাগে।

রামায়ণেও আছে! সীতা রামচন্দ্রের বাহুমূলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। তেম্‌নি করে' বরের বুকে মুখ রেখে শুয়ে থাক্‌তে তারও যে বড় সাধ যায়। সে কিন্তু তখন ঘুমিয়ে পড়বে না, চোখ দুটি বুজে চুপটি করে' শুয়ে থাক্‌বে, বর হয়ত ভাব্‌বে সে ঘুমুচ্ছে।···

আর দু'দিন বাদেই বিয়ে—বর, শুনেছে, দেখ্‌তে নাকি খুব সুপুরুষ।···

বুঁচীর যেন তর্ সইছিল না, মাগো! এ দুটো দিন কি করে' কাটে! গরীবের মেয়ের বিয়ে, কোনও ঘটাঘটি আয়োজন নেই, দূর-নিকট কোনও আত্মীয়-আত্মীয়ার নিমন্ত্রণ-আগমন নেই, এ যে কোনরকমে মেয়ে পার!

সূর্য্যাস্তের সময় একখানা রেলগাড়ী মাঠঘাট কাঁপিয়ে চলে' গেল. বুঁচী গ্রামের ধারে, মাঠের কিনারে, সেই পথখানির পাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌লে—বিয়ের পরদিন ওই গাড়ীতেই সে-হয়ত বরের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলে' যাবে!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,—সেই পথ ধরে' গয়লাদের দু'টি ছেলে শহর থেকে বাড়ী ফির্‌ছিল তাদের মুখে সেই একই কথা—ইংরেজের দেশে যুদ্ধ! এরোপ্লেনে নাকি বড্ড বোমা ফেল্‌ছে! এদের কেবল বোমা-ফাটারই কথা! আচ্ছা, এরোপ্লেনগুলো কি ওই বিশ্রী কাজে ব্যবহার না কর্‌লেই নয়? অমন জিনিষ—পুষ্পকরথের মত উড়ে যায়, তাতে চড়ে' বোমা ফেলা কেন?

বুঁচী এরোপ্লেন কখনও দেখেনি। তার হঠাৎ মনে হ'ল, এখানে একখানা এরোপ্লেন যদি উড়ে' এসে বোমা ফেলে যায়!

বোমা-ফাটার কথা মনে কর্‌তেই আতঙ্কে তার বুকখানা কেঁপে উঠ্‌ল।

সে-রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়েও সে বোমা-ফাটার দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়্‌ছিল, কতবার মনে কর্‌ছিল, ও-কথা আর ভাব্‌বে না, তার বদলে বরের সম্বন্ধে মিষ্টি-মিষ্টি স্বপ্ন দেখ্‌বে, কিন্তু কিছুতেই সে মন ঘোরাতে পার্‌ছিল না। ঘুমও আসে না ছাই! বুঁচী ভাব্‌তে চায়, খুব মিষ্টি করে' ভাব্‌তে চায়, বর, বর, বর আস্‌বে তার—

ভোর না হতেই বুঁচীদের বাড়ীতে একটু ব্যস্ততা এসে গিয়েছে আজ। কাল মেয়ের বিয়ে! বুঁচীর মা-ঠাকুমা এটা-ওটা নানাকাজে সেই সাত সকালেই ব্যস্ত হয়ে' পড়েছে। বাবা তার কন্যা সম্প্রদানের মন্ত্রগুলো পুঁথি খুলে পড়্‌তে বসে' গিয়েছেন, বরের বাড়ীর পুরুত এসে তাঁর কোনও ভুল ধর্‌তে না পারে।

হাজার গরীব-বাড়ী হ'লেও বিয়েবাড়ীর সহজ আনন্দ কোথা থেকে যেন বুঁচীদের বাড়ীর ঘরে-দুয়ারে উঠানে ভোরের আলোয় আল্‌পনা এঁকেছে। যজমান-বাড়ী থেকে দু'চারজন মেয়েও

মাঝে মাঝে আস্‌ছে, পুরুতঠাকুরের মেয়ের বিয়ে কাল।

তখন প্রায় বেলা দুপুর হবে, পিওন এসে বুঁচীর বাবাকে একখানা খাম দিয়ে গেল। টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম তো পুরুতঠাকুরের কাছে কখনও আসে না! টেলিগ্রাম কেন? পিওন হাতমুখ নেড়ে বলে' গেল—আমি জানি, কোনও খারাপ খবর নেই ঠাকুর—ভয় নেই। ভয় নেই!

তাহ'লেও, ইংরিজি টেলিগ্রাম পড়াতে তো গয়লাবাড়ীর ছেলেকে ডেকে পাঠাতে হবে। কে একজন যজমান-মেয়ে গিয়ে তাও একজনকে ডেকে নিয়ে এল।

বরকর্ত্তা টেলিগ্রাম কর্‌ছে—টাকা পাঠাতে, টেলিগ্রাফেই পাঠাতে, অন্ততঃ একশ'টি টাকা, বরযাত্রীদের আনার রেলভাড়া!

বুঁচীর বাবার মাথায় বজ্রাঘাত!

একশ' টাকা রেলের ভাড়া। কোথায় পাবে সে? এত টাকা লাগে রেল ভাড়ায়?—তবে, তবে···

ব্রহ্মোত্তর বাঁধা রেখে হেদায়েৎ দু'কুড়ি টাকা দিয়েছে—ঋমিটুকু তাকে যদি বেচে দেয় তা হ'লে সে কি পাঁচ কুড়ি দেবে? ·মিঞা যা শক্ত লোক!

বাড়ীসুদ্ধ সবাইকার যেন যুদ্ধের বিষবাষ্পে জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে—তবে কি বুঁচীর বিয়ে হ'ল না? একশ' টাকা যে অনেক টাকা! এতো টাকা লাগে রেলের ভাড়ায়? গরীব লোক এত টাকা কোথায় পাবে?—বিচার করে' ভাব্‌বার ক্ষমতাও তাদের নেই।

বুঁচীর বাবা টেলিগ্রামখানা ঘরের দাওয়ার চালে গুঁজে রেখে তাড়াতাড়ি ও-গাঁয়ে যাবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেছে! গরীব ব্রাহ্মণ আজ হেদায়েৎ-মিঞার পায়েই পৈতেগাছা জড়িয়ে ধর্‌বে, মনে-মনে এই তার সঙ্কল্প,—ব্রাহ্মণের কন্যাদায়!

বুঁচীর মা-ঠাকুমা হতাশ হয়ে একেবারে বসে' পড়েছে, একবার ডাকছেড়ে কাঁদ্‌তে পার্‌লে বুক হাল্‌কা হ'ত! ব্রাহ্মণ ফিরে এসে বল্‌লেন, 'টাকা পাওয়া গেল না।'

টেলিগ্রামের খামখানা চালে গোঁজা ছিল, খাচম্‌কা সেটা খসে পড়্‌ল, বুঁচী সেখানেই দাঁড়িয়েছিল, সে চম্‌কে উঠেছিল।

খামখানার ভেতর থেকেই যুদ্ধের বোম্‌ফাট্‌বে না তো? খবরের কাগজে সে-খবর কি ছাপ্‌বে?

চলচ্চিত্র

জে. বি.

শিল্পজগতে অধুনা চলচ্চিত্র এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে' দেখা গিয়েছে যে এই শিল্পই হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় শিল্প। কিন্তু আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, এই শিল্প এখনও তার কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করেনি। অন্যান্য দেশে যখন এই শিল্পের বহুমুখী উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে তখন আমরা এই শিল্প সম্বন্ধে এক রকম প্রায় উদাসীন। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ ও উন্নতির জন্য কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টাই এদেশে করা হচ্ছে না। এবং যা-ও করা হয় তাও নিতান্ত নিম্নস্তরের। আসলে, আমাদের দেশে এই শিল্প সম্বন্ধে একটা দোকানদারী ভাব এসে পড়েছে। চলচ্চিত্র হচ্ছে রসঘন শিল্প এবং এতে দোকানদারী ভাবে দর কষাকষি করায় এর রসবোধ ক্রমশঃই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ফলে, আমাদের দেশে এর উপর একটা অশ্রদ্ধা, একটা অস্বাভাবিকতা এসে গেছে।

চলচ্চিত্র-শিল্প নানা ভাগে বিভক্ত। সাধারণতঃ আমরা একে তিন পর্য্যায়ে ফেল্‌তে পারি। প্রযোজক, পরিচালক ও পরিদর্শক। এদের মাঝামাঝি বিভাগও রয়েছে, সেটা হচ্ছে পরিবেশক। এই প্রত্যেক বিভাগই পুনরায় বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এই বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতাই এই শিল্পের পূর্ণ পরিণতি এনে দেয়। আমরা আমাদের এ-বিভাগে এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর্ব এবং আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্ত রচনা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি এতে প্রকাশিত হবে।

চিত্রে কি চাই

চিত্রে ও বাস্তব জীবনে প্রভেদ যাই থাকুক না কেন, চিত্র বাস্তব জীবনেরই অণুকৃতি এঁকে দ্যায়। অর্থাৎ, বাস্তবের অনুকরণে রূপালী পর্দ্দায় ঘটনার সমাবেশই প্রযোজক ও পরিচালকের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যকে সফল কর্ত্তে হ'লে চিত্র-নির্ম্মাতাদের প্রধান লক্ষ্য হবে চিত্রের প্লট নির্ব্বাচন। এমন প্লট নির্ব্বাচন কর্ত্তে হবে যাতে তার রস-আবেদনে কখনও ব্যাঘাত না ঘটে, দর্শকদের চিত্তে যেন কখনও বিরক্তি উৎপাদন না করে। ঘটনার পরিণতি যেন সর্ব্বাঙ্গীন ও সুষ্ঠু হয়। পরিণতি যেন হয় অতি স্বাভাবিক ভাবে। কোনপ্রকার চমক-লাগা কিম্বা সস্তা প্যাঁচ যেন তাতে কখনও না থাকে।

অবশ্য, মানুষের বাস্তব জীবনে এমন সব ঘটনাও ঘটে যাদের কার্য্য-কারণ কিম্বা পরস্পর সঙ্গতি সম্বন্ধে কোন প্রকার স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকে না। নিতান্ত অতর্কিতে কিম্বা কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে এরূপ ঘটনা ঘটে' যায়। রূপালী পর্দ্দায় কিন্তু এরূপ ঘটনার স্থান বিরল। চিত্র-নির্ম্মাতা যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ঘটনার অনুকৃতি রূপালী পর্দ্দায় দেখান তাহলে দর্শকচিত্তকে তা কখনও আনন্দ দেবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাগুলির প্রধান সঙ্গতি রক্ষা কচ্ছে সময়। কিন্তু সময়

দিয়ে যাদের যোগাযোগ রক্ষিত হয় তেমন ঘটনা রূপালী পর্দ্ধায় কী করে' মাত্র দু'ঘণ্টার ভিতর দর্শকচিত্তকে সাড়া দেবে। রূপালী পর্দা সম্বন্ধে শুধু এই বিচার করতে হবে যে দেখব কাহিনী নিয়ে প্লটের সৃষ্টি করা হ'ল সেগুলো সম্ভবপর কিনা এবং তাদের সঙ্গতি স্বাভাবিক কিনা। এদিকে নিখুঁত দৃষ্টি রাখলে ছবি দর্শকদের ভাল লাগবেই।

ঐতিহাসিক প্লট

ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও চিত্র-নির্ম্মাণ চলতে পারে, এবং এরূপ ঘটনা নিয়ে চিত্র প্রস্তুত হ'লে তার প্রসার বহুমুখী হবেই। কিন্তু চিত্র নির্ম্মাতাকে দেখতে হবে কী রূপ তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিক চিত্র নির্ম্মাণ করা যায়। সাধারণত দেখা যায়, ঐতিহাসিক চিত্রনাট্যকাররা চিরাচরিত নাটকীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পারেন না। ফলে, ঘটনা-সঙ্কুল কাহিনী সঙ্গত ও স্বাভাবিক দৃশ্য-পারম্পর্য্যের এলাকা পার হ'য়ে দর্শকের চিত্তে যান্ত্রিক ও জটিল আবহাওয়ার অবতারণা করে। ঐতিহাসিক চিত্রেও চরিত্র-স্ফূর্ত্তির জন্য সংলাপের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু, সূক্ষ্মতা দূরের কথা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিনেতাদের কণ্ঠযুদ্ধ শব্দযন্ত্রের অসংযমের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে' দর্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়কে এক বিকট ও বীভৎস রসের পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করে।

ঐতিহাসিক চিত্রে দৃশ্য-সংস্থানও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক। প্রযোজকের কার্পণ্য ও পরিচালকের অজ্ঞতা অনেক সময় উপযুক্ত দৃশ্য নির্ব্বাচনে অন্তরায় হয়। ঐতিহাসিক চিত্রে গঠন-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ করে' অবহিত না হ'লে ছবির টেকনিক্, ভারসাম্য, এমন কি, অভিনয় উৎকর্ষতা ও সার্থক ঘটনা-সঙ্গতিও ব্যর্থ হয়।

ঐতিহাসিক চিত্রকে মঞ্চগত না করে' রূপালী পর্দার উপযোগী করে' তোলার ভার একান্ত ভাবে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের। চলচ্চিত্র, বিশেষ করে' ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র যেখানে মঞ্চের সংস্কারকে উপেক্ষা করে' পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করে, সেখানে পরিচালক সাধারণ কৃতিত্বের চাইতে চলচ্চিত্র-শিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রগতির সহায়ক হিসাবে প্রশংসা অর্জ্জন করেন বেশি।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি

চিত্রে ট্র্যাজেডি ও কমেডি ব্যাপারেও খুবই সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষয় নির্ব্বাচন ট্র্যাজেডি হবে কি কমেডি হবে—এ নিয়ে বহু বিতর্ক আজও চলে' আসছে, কোন একটা সুমীমাংসা এ-সম্বন্ধে এখনও হয়নি। বিষয়টি খুবই জটিল—সুতরাং এ-সম্বন্ধে চট্ করে' কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া খুব সহজ কাজও নয়। কিন্তু মানুষের মনকে খানিকটা ভাববার খোরাক দেওয়ার পক্ষে ট্র্যাজেডির স্থানই খুবই প্রশস্ত। জলে দাগ কাটলে তার স্থায়িত্ব যেমন থাকে না তেমনি কমেডি নিয়ে বিষয় নির্ব্বাচনও তার স্থায়িত্ব দর্শক মনে গভীর দাগ কাটতে পারে না। ট্র্যাজেডি হচ্ছে ঘটনা ও কর্ম্মের অনুকরণ এবং বিষয় বস্তু নির্ব্বাচন হচ্ছে ঘটনা ও কর্ম্মের রূপায়ন। একথা খুবই স্বীকার্য্য, যে, চিন্তার তখনই প্রয়োজন হয় যখন তাতে প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা এসে দেখা দেয়। এবং যা ট্র্যাজেডি তাতে প্রমাণই মুখ্য। সুতরাং, চিত্র-নির্ম্মাণে প্রযোজক ও পরিচালকগণ যদি প্লট সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ট্র্যাজেডি নির্ব্বাচন করেন তাহ'লে তা হবে সুবিবেচকের কাজ।

চটকদার ছবি

সূক্ষ্মরস-সম্পন্ন ছবির চাইতে চটকদার ছবির প্রচলনই এ-দেশে বেশি। তার কারণ, আমাদের দেশে আজও স্থূল শিল্প-সংস্কারের মূলধন নিয়ে চলচ্চিত্রের ব্যবসায় সম্ভব হচ্ছে। এই শিল্পের সঙ্গে যাঁরা আজ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের অধিকাংশই দেশীয় যাত্রা ও নাটকের সুলভ সংস্কার থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হ'তে পারেন নি। এর উপর, যন্ত্রগত আনন্দ-সম্পর্কে এ-দেশীয় শিল্পকার ও দর্শক উভয়েরই কোনো স্পষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না।

চলচ্চিত্র থেকে আনন্দ-আহরণের প্রেরণা সম্ভব হয়েছে এ-দেশের মঞ্চের কল্যাণে। ধর্ম্ম, নীতি ও আদর্শ প্রচারের বাহন হিসেবেই অধিকাংশ নাটক মঞ্চ অধিকার করে' ছিলো, কিন্তু নিছক ব্যবসায়ের দিক থেকে সেগুলি কোনোদিনই বিশেষ সফল হয়ে ওঠেনি। হাল্কা রস ও হাসি যে-সব নাটকের বিষয়বস্তু সেগুলি বরং সহজেই দর্শক আকর্ষণ করেছে।

মূল প্রেরণার দিক থেকে নাটক ও চলচ্চিত্রে ঐক্য থাকলেও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি। চলচ্চিত্রের উৎপাদন-পদ্ধতি একান্তই যন্ত্রগত। তার উপর, ভারতবর্ষ যন্ত্রশিল্পের ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী বলে' ব্যবসায়ের দিক থেকে একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র-নির্ম্মাণ এ-দেশে রীতিমতো ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ব্যয়ের অঙ্কের দিকে দৃষ্টি রেখে চিত্র-ব্যবসায়ীরা নিশ্চিত আর্থিক-সাফল্য সম্বন্ধে মনোনিবেশ করেন সর্ব্বাগ্রে। নিশ্চিতভাবে দেখা গেছে যে, ছবির বিষয়বস্তুতে সূক্ষ্ম আবেদনের পরিবর্ত্তে স্থূল, অর্থহীন হাসি ও কান্নার উপকরণ বা আদিরসের আধিক্য থাকলেই তা' নিঃসংশয়ে অধিকাংশ দর্শকের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়। সুতরাং, পরিচালক ও প্রযোজক আর্টের অনুশীলন স্থগিত রেখে ব্যবসায়ের খাতিরেই অসঙ্গত ও অবান্তর উপকরণ দিয়ে ছবিকে যথাসম্ভব চটকদার করে' তুলতে অনুপ্রাণিত হন—দায়িত্বশীল মন নিয়ে দর্শকের রুচি ও সংস্কারের উন্নতি-সাধনে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না। অথচ, রঙ্গমঞ্চের তুলনায় চলচ্চিত্রে সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও গভীর ভাবের অভিব্যক্তির সুযোগ সর্ব্বদাই বেশি।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে যদি বৈচিত্র্যের আভাষ পরিলক্ষিত না হয়, তা'হলে এই চটকদার ছবিই অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পের সমাধি রচনা করবে। ভারতবর্ষে, জনসমাজের কল্যাণের দিক থেকে চলচ্চিত্র-ব্যবসায়কে সম্পূর্ণভাবে শিল্পসম্মত করে' তুলবার দিন নিশ্চয়ই এসেছে। এখন, চটকদার ছবির মোহ থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে' চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা সূক্ষ্ম রসবোধ ও আর্টের সীমানায় পা দিলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে' মনে হয় না।

চিত্র-পরিচিতি

গল্প স্বাভাবিকভাবে, চিত্রের ব্যবহারোপযোগী না হ'লে এবং চরিত্র নির্ব্বাচনে ত্রুটি ঘটলে একখানি ছবির সাফল্য কী ভাবে ব্যাহত হয় তার নিদর্শন অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রোডাক্সন্সের প্রথমতম ছবি 'আলোছায়া'। চিত্রোৎকর্ষের সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দৃশ্য পারম্পর্য্যের বিচ্ছিন্নতা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অনুভূতিগুলির সহজ অভিব্যক্তিতে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চিত্র-গল্পের কোনো

একটি ক্ষুদ্র ঘটনাই দর্শকের চিত্তে ঢেউ তুলতে সমর্থ হয় নি। তবে 'আলোছায়া'র সংলাপের ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতা প্রশংসনীয়। নাম-করা অভিনেতা ও অভিনেত্রী বা বিখ্যাত গায়কের সমাবেশ হ'লেই যে ছবির সাফল্য অনিবার্য্য হ'য়ে উঠবে এ ধারণা ভ্রমাত্মক। পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠ পরিবেশনের উদ্দেশ্যকে হয়তো কোনক্রমে সমর্থন করা যায়, কিন্তু তাঁকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখলে পরিচালকের চিত্রবুদ্ধি সম্বন্ধে রীতিমতো সন্দেহ হয়।

শ্রীমতী আশালতা—সারকো প্রডাকসনের "সোহাগ" চিত্রে
অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছেন।

সিনেমার কাহিনী সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হওয়ার সার্থকতা যে কতো তা' ফিল্ম প্রোডিউসার্সের 'শুকতারা' ছবিখানি দেখলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। দক্ষ পরিচালক প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনাকেই মূলকাহিনীর পরিণতিমুখী হিসেবে যোজনা করেছেন। মোটামুটিভাবে, ঘটনার গঠন ও অবস্থান চিত্রনাট্যের সাফল্য এনে দিয়েছে। দু' একটি অপ্রত্যাশিত বাঁক বর্জ্জন করলে ছবিখানি নিঃসন্দেহে আরো উৎকৃষ্ট হ'তে পারতো। সব দিক দিয়ে, চিত্রের নির্ম্মাণ কুশলতার জন্য পরিচালক কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। অবশ্য, বাঙ্গালী দর্শকের চিত্তজয়ের সার্ব্বজনীন আবেদন এই চিত্রের সাফল্যে সব

চাইতে বেশি কাজ করেছে। 'শুকতারা' চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রাবতী ও প্রতিমা দাশগুপ্তার অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

এ-দেশের ষ্টুডিয়ো-সংবাদ

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

বিখ্যাত গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ঘটনাপ্রধান একটি

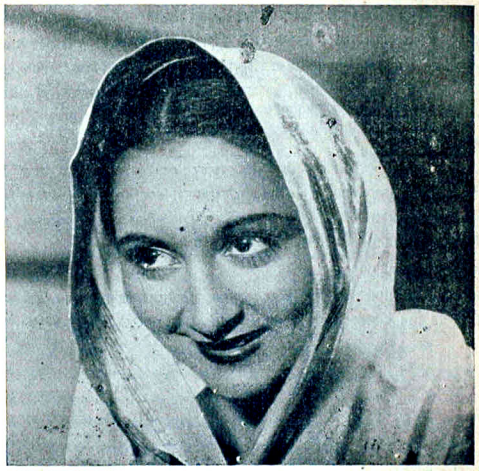

শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জ্জি—বহু চিত্রে স্বাভাবিক অভিনয়
নৈপুণ্যে চিত্রামোদীদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড সম্প্রতি 'ডাক্তার' নামক একখানি চিত্র গঠন করেছেন। এই চিত্রে বিখ্যাত ও পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও একজন বিশিষ্ট নবাগতার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে' প্রকাশ। 'ডাক্তার'এর পরিচালক হচ্ছেন ফণী মজুমদার। ছবিখানি 'আলোছায়ার' পরেই মুক্তিলাভ করবে।

অমর মল্লিক পরিচালিত 'অভিনেত্রী'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে এল। 'অভিনেত্রী'র সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রাইচাঁদ বড়াল। নৃত্যশিল্পী শরদিন্দু সিংহ (ইনি বহুদিন উদয়শঙ্করের দলভুক্ত ছিলেন) মঞ্চাভিনয়ের সময় কয়েকটি নৃত্য দেখিয়েছেন।

দেবকী বসুর পরিচালনায় দোভাষী চিত্র 'নর্ত্তকীর' কাজও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রীমতী লীলা দেশাই।

মতিমহল থিয়েটার্স

সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি মধ্যবিত্ত ছন্নছাড়া বাঙালী পরিবারের গল্প নিয়ে মতিমহল থিয়েটার্স 'ব্যবধান' নামে একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলেছেন। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন ফণী বর্ম্মা। ইনি এ পর্য্যন্ত একাধিক বাঙ্‌লা ছবির পরিচালনা করেছেন বটে, কিন্তু কোথাও তেমন কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। যাহোক্, শীঘ্রই ছবিখানি সুসংস্কৃত 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

মিনার্ভা মুভিটোন্

এঁদের পরবর্তী সামাজিক চিত্র 'ভরসা' প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ছবিখানি শীঘ্রই বম্বের একটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে বলে প্রকাশ। সোরাবমোদী প্রযোজিত এই চিত্রখানিও বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করবে বলে' মনে হয়। 'ভরসা'র বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চন্দ্রমোহন, সর্দ্দার আখতার, শীলা, মায়া দেবী, ইরাচ তারাপোর প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা।

ওয়াদিয়া মুভিটোন

শ্রীযুক্ত মধু বোসের পরিচালনায় বম্বের ওয়াদিয়া মুভিটোনের ত্রিভাষী চিত্র 'রাজনর্ত্তকী'র চিত্রগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হচ্ছে বলে' প্রকাশ। সম্প্রতি রাসমঞ্চের সেটে চিত্রগ্রহণ চলছে।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী

১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১ পটুয়াটোলা লেনের 'ইণ্ডর প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়